আমাদের ছুটি

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

মহারাষ্ট্রে জঞ্জীরা দুর্গ যাওয়ার পথে - আলোকচিত্রী- শ্রী পল্লব ব্যানার্জি

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা - ভাদ্র ১৪২২~

কিছুদিন বাড়িতে থাকলেই মনটা কেমন উড়ুউড়ু করে। সব্বার হয় এটা। দূরপাল্লার রেলগাড়ির দিকে তৃষিত চোখে তাকাই। দ্রুত ছুটে যাওয়া জানলা দিয়ে এক ঝলক দেখতে পাওয়া কোনো মুখ মনকে ক্ষণকালীন নাড়া আর দীর্ঘকালীন বেদনা দিয়ে চলে যায়। ট্রেনের ডাকের তালে তালে মনও উত্তর দেয়, যাই, যাই...। কেউ বেড়াতে যাচ্ছে শুনলেই মনটা চাতকের মতো ছটফট করে ওঠে।

বর্ষার শেষে এসে উৎসবের ঋতুর ক'দিন আগে 'আমাদের ছুটি'-র মেজাজ এবারে খানিক অন্যরকম। একটু ঘরোয়া আবার একটু-বা চেনা পথের বাইরে। ঝরোঝরো মুখর বাদর দিনে দুই বাংলার অজ শহর আর গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে মাটির সোঁদা গন্ধ আর জলের অচেনা ছবি আঁকলেন তপনদা আর রফিকুল। ওড়িশার প্রায় অচেনা 'নৃসিংহনাথ', মহারাষ্ট্রের ম্যাপে আছে অথচ স্থানীয় মানুষজনই নাম জানেননা এমনই অজানা 'মুরুড' কিংবা কেরলের পেরিয়ার লেকের নিমজ্জিত অরণ্য - এইসব পড়তে পড়তে মনটা কেবল যাই যাই করছিল ঘরে বসে বসে।

ছুটন্ত রেলগাড়ির কামরা থেকে বাইরেটা দেখার মতো স্মৃতিগুলো হু হু করে পেছনের দিকে ছুটে যায় - যেন কত কাল, কত যুগ আগের অস্পষ্ট ছায়াছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে কালকের ঘটনার মত...

বর্ষার একঘেয়ে ঝরঝর শব্দ আর কাদা-জল পেরিয়ে যখন ঘন সবুজের মাঝে মাঝে সাদা কাশের দোলা লাগে তখন মনে কী রকম একটা আনচান-আনচান ভাব জাগে। পুজো আসছে, বেড়াতে যাব। কী মজা ! কী আনন্দ ! স্কুল খুললেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা অতএব পড়াশোনা আছে, নতুন পুজোবার্ষিকী আছে, কিন্তু তারপরেও অঢেল সময় আছে কল্পনার -

নিকষ কালো রাত ফুঁড়ে রেলগাড়ি ছুটে চলেছে। এরমধ্যেই জানলার ধারে বসা নিয়ে একপ্রস্থ লড়াই হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে উদার দাদা দাবি ছেড়েই দিয়েছে শেষপর্যন্ত। লড়াই শেষে ক্লান্ত মুখ জানলার গায়ে ঠেকিয়ে তখন নিশ্চিন্দিপুরের বালক অপু হয়ে যাওয়া আর ঘুটেঘুটে অন্ধকারে এক ঝলক যদি আলো দেখা যায় সেই আশায় অপলক তাকিয়ে থাকা। বাতাসে চুল ওড়ে, চোখে কয়লার গুঁড়ো এসে পড়ে। তাতে কী আর যায় আসে! বিশ্বচরাচর দোলে, তাল মিলিয়ে চাকার বাজনার সঙ্গে - তুমি যেমন ভাববে চাকাও সেই একই কথা বলে বলে যাবে। তুমিও দুলবে, দুলবে জলের ভারি বোতলটাও ট্রেনের তালে তালে। ঘোর অনিচ্ছা নিয়ে জ্বলতে থাকা দু'একটা মিটমিটে হলদেটে আলোও নিবে আসবে ক্রমশঃ।

কল্পনা আর ভাবনা মিলিয়ে মাথার মধ্যে সারাদিন একটা নেশা-নেশা আমেজ। এবারেও কি মায়ের সঙ্গে এক বার্থেই শুতে হবে? আরও কতটা বড় হলে একা একা শুতে পাব? মায়ের বকুনি, অনিচ্ছায় শুয়ে পড়া - দুলতে দুলতে ঘুম ঘুম চোখে ভাবা কাল দুপুরে ট্রেনে নাকি স্টেশনে খোপকাটা থালায় খাওয়া হবে। কী সুন্দর ডাল-তরকারি-আচার-টক দই আলাদা আলাদা খোপে ভাগ করা থাকে!

অবশেষে সব অপেক্ষা আর কল্পনার ইতি - আহ্... কালকে আমাদের ট্রেন। বাবা-মা সুটকেস, হোল্ডঅল গুছোচ্ছে, নতুন জামার গন্ধ, দুই ভাই-বোনের মনে অসম্ভব উত্তেজনা। কিচ্ছু ধরতেই দিচ্ছেনা, অন্ততঃ ওয়াটার বোতলে জলটা ভরি? সারা সন্ধে-রাত ঘোরের মধ্যে কাটে। ট্রেনের দুলুনি ক্রমে মনের থেকে শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। মাথার মধ্যে ট্রেনের চাকার তালে বেজে চলেছে... কাল বেড়াতে যাব.... বেড়াতে যাব...যাব...যাব...।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

দেখ্‌তে দেখ্‌তে উক্ত অশ্বারোহী আমার নিকটবর্ত্তী হলেন। গুঁতো, কিল, লাথি এবং উৎসাহবর্দ্ধক নানারূপ শব্দ ঘোড়ার উপর অজস্রধারে প্রয়োগ কর্ত্তে কর্ত্তে, আমার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে তিনি আমায় ছাড়িয়ে চলে গেলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই কিললাথিবর্ষী নির্ভীক অশ্বারোহী পুরুষ আর কেউ নয় - শ্রীযুক্ত সদানন্দ দেবশর্ম্মা! তারপর তাঁকে ধরে ওঠা আমার প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল, এমনি সবেগে, সাবেগে তিনি ঠাণ্ডা পাহাড়ী টাট্টু ছুটিয়ে চলেছেন। -

'অশ্বপৃষ্ঠে' সরলা দেবী চৌধুরাণীর কলমে

জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুণোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র পঞ্চম পর্ব - "গঙ্গোত্রীর পথে"

~ আরশিনগর ~

বাদল দিনে - তপন পাল

একটি মফঃস্বলী বৃত্তান্ত - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

বাংলার অজপাড়া এক গাঁয়ে
- রফিকুল ইসলাম সাগর

~ সব পেয়েছির দেশ ~

অলৌকিক রাতে কুয়াশাভেজা মৈনাম-লা
- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশ্মীরের পথে পথে - শুভ্রা মিত্র

হঠাৎ ইচ্ছার নৃসিংহনাথে - সুদীপ চ্যাটার্জি

~ ভুবনডাঙা ~

জন ন্যাসের খোঁজে প্রিন্সটনে - অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্তের আমেরিকা দর্শন - সুস্মিতা রায়

~ শেষ পাতা ~

মোহময়ী মুরুড - পল্লব ব্যানার্জি

এক নিমজ্জিত অরণ্যে - জামাল ভড়

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী-প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য পুরনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকার পাতায়।

[১৮৭২-এর ৯ সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠ কন্যা সরলার জন্ম হয়। বেথুন স্কুল থেকে এনট্রান্স ও পরে বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে তিনি বি.এ. পাস করেন। ছোটবেলাতেই সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনায় হাতেখড়ি। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তাঁর রচনা 'সখা' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এর কিছু পরে 'ভারতী'-তে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনাও করেন দীর্ঘকাল। ১৯০৪ সালে সরলা দেবী বাংলার নানা জায়গায় "বীরাষ্টমী ব্রত" চালু করেন। সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার অনুগামীদের অন্যতম প্রেরণাস্থল ছিল বীরাষ্টমী উৎসব। স্বদেশি দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি এই সময় 'লক্ষীর ভাণ্ডার' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন।
"বন্দেমাতরম" সংগীতের প্রথম দুই পদে সুর-সংযোজনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বাকী কথাগুলিতে সুর বসিয়েছিলেন সরলা দেবী। ১৯০৫-এ বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে "বন্দেমাতরম" গেয়ে আলোড়ন ফেলেন তিনি। তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলি 'শতগান' (১৯০০) ও 'গীত-ত্রিংশতি' (১৯৪৫) বইতে সংকলিত হয়। বাড়ির অমত সত্ত্বেও অল্প কিছুদিনের জন্য সরলা দেবী মহীশূরের মহারানী স্কুলের শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৫-এই পঞ্জাবের বিখ্যাত আইনজ্ঞ, জাতীয়তাবাদী নেতা ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত রামভূজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি ১৯০৭-এ লাহোর থেকে 'হিন্দুস্থান' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পাঞ্জাবে বসবাসকালে স্বাদেশিকতা প্রচার ও সমাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১০-এ এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সরলা দেবী একটি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের উদ্যোগেই সুপ্রসিদ্ধ "ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল" প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯১৯ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত রামভূজ জেলেই অসুস্থ হয়ে মারা যান ১৯২৩ সালে। স্বামীর মৃত্যুর পর সরলা দেবী কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৩০ সালে বয়স্কা মহিলাদের প্রবেশিকা অবধি শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "ভারত-স্ত্রী-শিক্ষাসদন"।
১৯৪৫ সালের ১৮ আগষ্ট কলকাতায় এই মহীয়সী নারীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' (১৯৪৫) বাংলা স্মৃতি-সাহিত্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১২৯৮ থেকে ১৩৩৯ এই চার দশক ধরে সরলা দেবী ভারতী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় ভ্রমণ কাহিনি লিখতেন। লেখার প্রতি ছত্রে তাঁর রসবোধ পাঠককে মুগ্ধ করে।

অশ্বপৃষ্ঠে

সরলা দেবী চৌধুরাণী

দার্জ্জিলিঙ থেকে রঙ্গিৎ যাবার অভিপ্রায়, তিনজনের তিনটী ঘোড়ার আবশ্যক। এখন ঘোড়া পাওয়া যায় কোথায়? - সেইটেই কিছু সমস্যা। সায়েব বাড়ীর কথাটা একবার বিচারে আনা গিয়েছিল, কিন্তু মনের সে আর্জিটি বেশী দূর পেশ হতে না হতেই তাকে চটপট্ ডিস্‌মিস করে দেওয়া গেল; - সায়েব বাড়ির ঘোড়ায় আমাদের পোষাবেনা। মূল্য বাহুল্যের জন্যে? ছোঃ - সে কথা যেন স্বপ্নেও কারো মনে না হয়, - ইতর পয়সার জন্যে কি আমরা কেয়ার করি? কিন্তু দেশানুরাগ তখন আমাদের মনে বড় প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাই ঠিক করা গেল সাহেবকে টাকা দিয়ে দিশী লোককে বঞ্চিত করা হবে না।
যাব আমরা তিনটী; সে তিন জনের পরস্পরের সম্বন্ধ ব্যক্ত করা অনাবশ্যক, শুধু বয়সের তারতম্যানুসারে বলা যাক্ একজন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, একজন বয়ঃকনিষ্ঠ ও আমি স্বয়ং। আমাদের দলের আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা এবিষয়ে বড় গা কর্‌তেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা আগের বছর রঙ্গিৎ ঘুরে এসেছেন, কারো বা অতখানি সখ নেই, কিম্বা থাক্‌লেও তার খাতিরে অতখানি শক্তিক্ষয়ের প্রবৃত্তি নেই। তাই তাঁহাদের সহানুভূতির উত্তাপের কোলে আমাদের শিশুসংকল্পটি লালিত হয়নি। একেত পয়সার খাঁকতি - থুড়ি! দেশানুরাগ! তার উপর আবার দলের উৎসাহের অভাব - নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সংকল্প মানুষ হতে লাগল। শ্রীমান মৎকনিষ্ঠ প্রতিদিন একবার করে দার্জ্জিলিঙ সহরের অলিগলি ঘুরে আসেন কোথাও যদি কোন খোট্টা ঘোড়াওয়ালাকে আমাদের দেশানুরাগের পাত্র হতে সম্মত করে আস্‌তে পারেন; কিন্তু তাঁর সাধুসংকল্পে অকৃতকার্য্য হয়ে প্রতি সন্ধ্যায় নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরে আসেন।
শ্রীযুৎ মদগ্রজ, - সদানন্দ ইতি প্রসিদ্ধ - একরকম উদাসভাবে বাড়ীতে বসে কাল কাটান, যেন সব ফাঁকা ফাঁকা, কি যেন চান, কি যেন পাননা, যেন তারিণী বামুনের রান্না মুখে আর রোচে না, যেন গফুরের হাতের গরম কাট্‌লেট অনেককাল আস্বাদন হয়নি - যেন রঙ্গিৎ বড় বহুদূরে, নিতান্ত আয়ত্তের বাইরে। শর্ম্মা কিঞ্চিৎ সংযত আগ্রহের সঙ্গে শ্রীমানের পথ চেয়ে বসে থাকেন। এইরকম ত আমাদের তিনজনের অবস্থা, এমন সময় একদিন সন্ধ্যেবেলায় তাঁর নিত্যপর্য্যটন থেকে ফিরে এসে ভায়া বললেন, "ঘোড়া যোগাড় করে এসেছি, তিনটে ঘোড়া একদিনের জন্যে বার টাকায় রফা হয়েছে; কাল ভোরে আস্‌বে, আজ রাত্তিরেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখ।" আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। একেত ভায়ার যোগাড়, তার উপর বার টাকার রফা! অসম্ভব সস্তা - আমরা সকলে হেসেই উড়িয়ে দিলুম - "তোর কথায় অমনি ঘোড়া এল, নিশ্চয় তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। সে বারম্বার আমাদের আশ্বস্ত কর্ত্তে লাগল, তখন কতক বিশ্বস্ত কতক সন্দিহান চিত্তে যাত্রার আয়োজনে মনোনিবেশ করা গেল। আমাদের এসম্বন্ধীয় আশা নিরাশা, সুখদুঃখ কিন্তু দলের অন্যান্য লোকদের স্পর্শও করেনা, তাঁরা আমাদের চাঞ্চল্যে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে সমান অবিশ্বাস ও সমান ঔদাস্যের সঙ্গে প্লেটের উপর হোসেঙ্গি কাবাবের সাতটি করে কাটি একে একে নিঃশেষিত মাংস করলেন। উৎসাহে আগ্রহে আমাদের সে রাত্রি প্রায় অনশনে কাট্‌ল। তার পরদিন ভোরে আমরা বিছানা থেকে উঠ্‌বার আগেই বাইরে অল্প সোরসরাব পড়ে গেল। চাকররা এ ওকে জাগায়, সে তাকে ডাকে। একজন দরজা খুলে ঘরে এসে আমাদের জাগিয়ে

দিয়ে বল্লে, "বাবুরা উঠুন, ঘোড়া এসেছে।" তখনও বাবুদের ভালরকম চেতনা হয়নি, তখনও চোখে নিদ্রা এবং মনে বিস্মৃতি আছে, কিন্তু যেমন উচ্চারণ হল "ঘোড়া এসেছে," অমনি সে বৈদ্যুতী প্রভাবে বাবুদের সুপ্তস্নায়ু সব সজাগ হয়ে উঠ্‌ল, বাবুরা তড়াক্ করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে সাজসজ্জা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। বাইরে আসা গেল। অল্প অল্প আলোতে জিনশুদ্ধ তিনটী ঘোড়া দেখ্‌তে পেলুম, একটী লাল ও দুটী সাদা; সইসরা লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে, লাগামের লোহার টুক্‌রো দাঁতের মধ্যে করে ঘোড়ারা শব্দ কর্‌ছে, আর মধ্যে মধ্যে পাথরে খুর ঠোকারও শব্দ হচ্ছে। সেদিন ভোরের বেলায় পাহাড়ের উপর এই দুটী শব্দ আমাদের কানে যে কত মধুর লেগেছিল তা আর কি বল্‌ব। আর একটু ফরসা হয়ে এলে ঘোড়ায় চড়্‌বার উপক্রম করা গেল। সে উপক্রমণিকা কিছু সময়সাপেক্ষ, এবং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে অশ্বারোহণে আমিই যৎকিঞ্চিৎ পারদর্শী, ভায়াও মন্দ নন, কিন্তু শ্রীযুৎ সদানন্দ সম্বন্ধে ও বিশেষণটা সুপ্রযুক্ত হয় না। হপ্তাতিনেক পূর্ব্বে আমাদের একবার সিঞ্চল প্রয়াণের প্রস্তাব হয়, তখন তিনি কি যান অবলম্বনে সেখানে যাত্রা কর্‌বেন সে বিষয়ে অনেক আলোচনা উপস্থিত হয়। তিনি লম্বায় সাড়ে চার হাত, আর ওজনে আড়াই মন; তাঁর বিপুল আঁটসাঁট দেহটীর পক্ষে দাণ্ডি নিতান্ত অল্পপরিসর। তা না হলেও তিনি দাণ্ডি চড়্‌তে নারাজ, কেননা সংস্কার আছে রোগী ছাড়া আর কোন পুরুষের দাণ্ডিওয়ালার কাঁধে চাপাটা নিতান্ত লজ্জাকর দৃশ্য, আর তাঁর মতন জোয়ানকে রোগী বলে চালান করাও কিছু শক্ত - কিছু, কিঞ্চিৎ। এদিকে পাহাড়ী ঘোড়াতেও হয়ত তাঁকে মানাবে না, সম্ভবতঃ তাঁর সবুট পদদ্বয় জননী ধরণীকে স্পর্শ করে থাক্‌বে। যদি বা বড় ঘোড়া পাওয়া যায় তাহলেও বিপদ, কেননা অশ্বারোহণে তিনি ষোল আনা অনভ্যস্ত এবং বার আনা অসম্মত। অবশেষে হেঁটে পাড়ি দেওয়াই তাঁর মত হল। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে এসংকল্প থেকে নিবৃত্ত করবার বিশেষ চেষ্টা কর্‌লে। শেষকালে এই সাব্যস্ত হল যে তাঁর জন্যেও একটা ঘোড়া অর্ডার দেওয়া যাক, কপাল ঠুকে তিনিত চড়ে বস্‌বেন তারপর যা থাকে বিধাতার মনে। তার পরদিন ঘোড়া এল, আর সবাই চড়্‌লে, তিনি কিছুতেই আমাদের সুমুখে চড়্‌তে রাজী নন। আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা কর্ত্তে লাগলুম, তাঁর ঘোড়ায় চড়ার বিষম চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ বাদে খবর পাওয়া গেল তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছেন, তখন আমরা স্ব স্ব অশ্ব ছুটিয়ে দিলুম।

আমি বোধ হয় সবচেয়ে এগিয়ে ছিলুম, একবার পিছনে চেয়ে দেখি আমাদের দলের আর কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। ঠিক পথে যাচ্ছি কি না একটু সন্দেহ হওয়াতে রাশ টেনে নিয়ে অন্যদের প্রতীক্ষা কর্ত্তে লাগলুম। খানিক পরে দেখি অদূরে একজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে আস্‌ছে। আমি ঠাওরালুম মৎকনিষ্ঠ; তার পিছনে দ্বিতীয় ঘোড়া না দেখে নিঃসন্দেহে স্থির কর্‌লুম, শ্রীসদানন্দ তবে সওয়ার হয়ে আর বেশীদূর অগ্রসর হননি, বাড়ীর উঠোনেই বোধ হয় দুচার কদম চলেই ঘোড়সওয়ারের স্বাদটা মেরে নিয়েছেন, আর বেশীর জন্যে লালায়িত হননি। মনে মনে বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করা গেল, এবং বাড়ী গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করে আরো আমোদের আশা রাখলুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে উক্ত অশ্বারোহী আমার নিকটবর্ত্তী হলেন। গুঁতো, কিল, লাথি এবং উৎসাহবর্দ্ধক নানারূপ শব্দ ঘোড়ার উপর অজস্রধারে প্রয়োগ কর্ত্তে কর্ত্তে, আমার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে তিনি আমায় ছাড়িয়ে চলে গেলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই কিললাথিবর্ষী নির্ভীক অশ্বারোহী পুরুষ আর কেউ নয় - শ্রীযুক্ত সদানন্দ দেবশর্ম্মা! তারপর তাঁকে ধরে ওঠা আমার প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল, এমনি সবেগে, সাবেগে তিনি ঠাণ্ডা পাহাড়ী টাট্টু ছুটিয়ে চলেছেন। সেদিন বাড়ী ফিরে এসে তাঁর উৎসাহের সীমা নেই। ঘোড়ায় চড়া এমন সহজ! তিনি রোজ একটা করে ঘোড়া ভাড়া করে সমস্ত দার্জ্জিলিং পর্য্যটন করে বেড়াবেন। কিন্তু তার পরদিন সকালবেলায় গায়ের ব্যথায় যখন বিছানা থেকে উঠ্‌তে পারেন না, তখন তাঁর উৎসাহ আঠার আনা নিবে গেল। আর অনেক কাল ধরে ঘোড়ায় চড়ার নাম করেননি। কিন্তু তারপর যখন ক্রমে গায়ে ব্যথা মরে এল, তার স্মৃতিও মরে এল, এবং পুনর্ব্বার অশ্বারোহণের দুঃসাহস মনে প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। লাথি গুঁতো ও তালুতে জিহবার সংস্পর্শজাত বিবিধ শব্দের জোরে তিনি ফের অশ্বারোহণের ভরসা রেখেছিলেন, কিন্তু তার উপক্রমণিকার পালাটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন। পাহাড়ী ঘোড়ায় একবার উঠেপড়ে, জিনের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে টাট্টুটির শান্তপ্রকৃতিতে বিশ্বাস জন্মে গেলে আর ভয় নেই, কিন্তু সেই ওঠার, সেই প্রথম আত্মসমর্পনের পর্ব্বটাই গোলযোগে। বুঝি বা এতদিনের বড় যত্নের আশা স্ফুটোন্মুখে বিসর্জ্জন দিতে হয়, রঙ্গিৎ দেখার সাধ নিতান্তই বিলোপ কর্ত্তে হয়। তাঁর পূর্ব্বের নৈরাশ্য, পূর্ব্বের ভয়, পূর্ব্বের দ্বিধা, সব ফিরে এল। এক একবার রেকাবে পা অগ্রসর করেন, আবার নামিয়ে নেন; একবার ঘোড়ার ডাইনে যান, একবার বাঁয়ে আসেন, কোনদিক থেকেই কিছু সুবিধা করে উঠ্‌তে পারেন না,- বিভীষিকা দুধারেই সমান ওজনের। প্রায় আধঘন্টাটাক এই রকমে কেটে গেল, ক্রমে রোদ উঠ্‌বার উপক্রম হল, আমরা অস্থির হয়ে উঠ্‌লুম, অবশেষে অনেক কষ্টে অনেক সাধ্যসাধ্যনায়, অনেক অনুনয়বিনয়ে, অনেক উত্তেজনাতাড়নায় তিনি বুকে খুব খানিকটা সাহস বেঁধে ফস্ করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস্‌লেন। ইতিমধ্যে আমাদের দলের সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই দর্শকবৃন্দের মুগ্ধদৃষ্টি পশ্চাতে রেখে আমরা তিনটী অশ্বারোহীপ্রবর যাত্রা কর্‌লুম।

তখনও রাস্তায় বেশী লোকের আবির্ভাব হয়নি। কেবল দুটী একটী ইংরেজ আকণ্ঠ বিপুল আল্‌ষ্টারবৃত হয়ে উষাভ্রমণে বেরিয়েছে। মল্‌রোড জনশূন্য। সেই প্রশস্ত পার্ব্বত্যপ্রাঙ্গণ অল্পক্ষণের জন্য ছুটী পেয়েছে, স্তরন্যস্ত অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা সম্মুখে রেখে, ক্ষণকালের জন্যে নিজের নিস্তব্ধ হৃদয়ের গভীরতায় সে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে, স্নিগ্ধশীতল প্রাতঃসমীরণ তাকে সস্নেহে বীজন কর্‌ছে। আমরা ভুটিয়াবস্তির রাস্তা ধরে চলতে লাগ্‌লুম। সেদিন প্রভাতে যাত্রারম্ভে আমাদের মনে কত আনন্দ, শিশুর মত পথে যা দেখ্‌ছি তাই ভাল লাগ্‌ছে। যখন অল্প অল্প অন্ধকারে বড় বড় গাছের তলা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, তখন সেই অন্ধকার, সেই গাঢ় ছায়াই আনন্দে মায়ায় মনকে সিক্ত কর্‌ছে - যেন এখানেই আমাদের খেলাঘর, যেন সত্যিই আমরা শিশু। যখন অল্পে অল্পে অন্ধকার দূর হয়ে আলোর উন্মেষ হচ্ছে সে আলোও কত বিস্ময় আন্‌ছে, তার মৃদু উত্তাপে শরীরে কেমন স্নিগ্ধতা সঞ্চারণ কর্‌ছে। সেদিন মনে হতে লাগ্‌ল আমরা রোজ কেন ভোরে উঠিনে, ভোরের এত উপভোগ্য সামগ্রী হেলায় হারাই কেন।

খানিকটা পথ অগ্রসর হয়ে একজন ভুটিয়া গোয়ালার সঙ্গে দেখা হল। সে যেন সেই পাহাড়ের প্রত্যুষের একটা অঙ্গ। যেদিন সিঞ্চল গিয়েছিলুম সেদিনও দেখেছিলুম, ভুটিয়া গোয়ালারা সূর্য্যোদয়ের আগেই সর্ব্বোচ্চ শিখরে যেখানে অনেকটা প্রশস্ত সমতল ভূমি আছে সেখানে গরুদের চরাতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের শুভ্রমুখ আর প্রত্যুষের তীক্ষ্ণ শীতনিবারণোপযোগী গায়ের কাপড়ে যেন তাদের শুভ্র, তীক্ষ্ণ শীতল ঊষারই একটা অংশ বলে বোধ হয়। গোয়ালা তার বাঁশের নল থেকে আমাদের দুধ ঢেলে দিলে, আমরা বাস্কেট থেকে গেলাস বের করে সেই কাঁচাদুধ নিয়ে খেলুম। বেশ স্বাদ! পথে নগদা পয়সা দিয়ে নিজের হাতে দুধ কেনা! কেমন রোম্যান্টিক! বাড়ী গিয়ে কেমন গল্প করা যাবে! এই আমাদের প্রথম ঘটনা।

তারপরে আমরা মাইলষ্টোন দেখে দেখে চল্‌তে লাগলুম। পাহাড়ের গায়ে কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ফুল দেখ্‌লেই তুলি, কোথাও বা ছাতা বাড়িয়ে লতা টেনে আনি, কোথাও শৈবাল জড় করি, কোথাও ফার্ণ, কোথাও স্ট্রবেরি এই রকম করে করে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। একটা খোলা জায়গায় এসে পড়্‌লে সূর্য্যটা যখন হঠাৎ ঠিক কপালের উপর কিরণ বর্ষণ কর্ত্তে লাগ্‌ল, আর তার তাপটা কিছু বেশী প্রখর বোধ হতে লাগ্‌ল, তখন যেন একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করা গেল। কিন্তু সেদিন - কিম্বা একটু সঠিক করে বল্‌তে গেলে, সেবেলা - আমাদের দুনিয়ার কিছুরই উপর অসন্তোষ নেই, তাই সূর্য্যের অত্যাচার বেশ ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করা গেল। ক্রমে বেলা বাড়্‌তে লাগ্‌ল, ক্ষুধার উদ্রেক হতে লাগ্‌ল, কিন্তু আমরা ঠিক করলুম রঙ্গিৎ না পৌঁছিয়ে মহাপ্রাণীকে তুষ্ট করা হবে না, পথে খেলে আর্দ্ধেক মজাই মাটী।

দার্জ্জিলিঙ সাত হাজার ফিট উঁচু, আর রঙ্গিৎ মোটে হাজার ফিট - এই ছ হাজার ফিট আমাদের নামতে হবে - আর এই উৎরাইটা ১১ মাইলের পথ। এখানে ঘোড়া ছোটাবারও যো নেই তা হ'লে ঠোকর খেয়ে ঘোড়া ও আরোহী দুজনেই পড়ে যাবে, - তাই আস্তে আস্তে যেতে হ'চ্ছিল। ফেরবার সময় চড়াই হবে তখন ঘোড়া ছুটিয়ে সময় সংক্ষেপ করা যাবে স্থির ছিল। এদিকে রোদ্দুরে এতটা পথ হাঁটতে হাঁটতে ঘোড়ারাও পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছে, বিশেষতঃ আমার বয়োজ্যেষ্ঠের অশ্বটী। যদিও তিনি তাঁর ঘোড়াকে বাঁচাবার জন্যে এক ফন্দি বের করেছিলেন। একটা ঘোড়া ক্রমান্বয়ে ১১ মাইল ধরে তাঁকে বহন কর্‌লে ফির্‌তি বেলায় নিতান্ত অসমর্থ হয়ে পড়্‌বে বলে তিনি ঠিক করেছিলেন মাঝে মাঝে ভায়ার সঙ্গে ঘোড়া বদ্‌লাবেন। তা হলে দুটোর মধ্যে পরিশ্রম ভাগাভাগি হলে কারোই তেমন বেশী কষ্ট হবে না কিন্তু এতে যে হিতে বিপরীত হবে তা কে জান্‌ত। যা হোক সে কথা পরে বল্‌ব। - তাই রাস্তার মাঝে

থেকে থেকে তিনি তাঁর ঘোড়া থেকে অবতীর্ণ হয়ে ভায়ার ঘোড়ায় চড়েন এবং ভায়া তাঁর খিন্ন ঘোড়াটির ভারলাঘব করেন। গরমে ঘোড়াদের পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে, এখন থেকে পথে ঝরণা পেলেই তারা আপনা হতে আরোহীকে সেই দিকে নিয়ে গিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে ঝরণায় মুখ দিয়ে জল খায়।

নীচে নামতে নামতে ক্রমে অনেক চা ক্ষেত দেখা দিলে, বহুসংখ্যক কুলি ক্ষেতে কাজ করছে - অধিকাংশই মেয়ে - আর একটা মস্ত শোলাহ্যাট পরা ঘোড়ায় চড়া সাহেব ছড়ি হাতে তাদের তদারক করছে। সাহেবের বাঙ্গলা কাছেই, আমরা তার গা দিয়ে গেলুম। আমরা যত নীচে নাবছি ততই গরম বাড়ছে, গাছ পালাও ক্রমে বদলাচ্ছে। দার্জ্জিলিঙের শীতে যে সব ফল মূল জন্মাতে পারে না, এখানে তার চাষ হয়। প্রথমেই আমরা কলাগাছ লক্ষ্য করলুম, কেমন স্নিগ্ধ সবুজ রঙ, অনেককালের পর একে দৃষ্টিগোচর করে বেশ মিঠে লাগল। আরও নীচের উপত্যকা থেকে অনেকরকম শাকশবজি, ধান চাল সব দার্জ্জিলিঙের হাটে বিক্রির জন্যে আসছে। তদুপযোগী ঘোড়ার উপর বস্তা চাপিয়ে বিক্রেতারা ক্রমাগত আনাগোনা করছে। আমরা চলেছি - পথশেষ হবার কোন লক্ষণ নেই, আমাদের যেন সে প্রত্যাশাও নেই। সত্যিই যে একসময় পথ ফুরোবে, আমরা একটা গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছব, পথ চলতে চলতে এটা যেন সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। হঠাৎ এক জায়গায় একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কানে এল - যেন দশ বারটা ট্রেন একত্রে সোঁ সোঁ করে ছুটেছে। আমরা ভারি বিস্মিত হয়ে গেলুম, এখানে ট্রেন কি করে এল? আমরা কি একেবারে সিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেচি? সইসদের কাছে শুনলুম তা নয় - ও রঙ্গিতের শব্দ। রঙ্গিতের শব্দ! পাহাড়ে নদী যে কেমন তা আগে জানতুম না, তাই নদীর ও রকম গর্জ্জন শুনে ভারি অদ্ভুত ঠেকল। প্রথমটা সইসটার কথায় পুরো বিশ্বাস হল না, কিন্তু যখন একটা গাছের ফাঁকে একবার রঙ্গীতের ক্ষীণ শুভ্ররেখা দেখতে পেলুম, আর শব্দের দিকও সেই দিকেই নির্দ্ধারণ করলুম তখন আর সন্দেহ রইল না। তখন আমাদের ভারি উৎসাহ হল। বাঁকে বাঁকে কখন সেই রেখাটি দেখতে পাব তার জন্যে ভয়ানক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলুম। ইতিমধ্যে সেই তন্বী রেখাটির কল্লোলধ্বনি, তার গম্ভীর নির্ঘোষ আমাদের মন অধিকার কর্ত্তে লাগল। যেমন যুদ্ধঘোটক দূর থেকে রণবৃংহিতি শুনে সেই দিকে কাণ পেতে চঞ্চল হয়ে উঠে, তার সমস্ত স্নায়ু তাকে সেই দিকে প্রধাবনে উন্মুখ করে আমাদেরও মন সেই রকম হতে লাগল। মনে হল যেন রঙ্গিৎ আমাদের ডাকছে, আমরা তাকে দেখবার জন্যে যেমন অস্থির হয়েছিলুম, সেও আমাদের পাবার জন্যে তেমনি ব্যগ্র হয়েছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের দেখতে পেলেই তরঙ্গবাহু তুলে বলছে "আয়! আয়! আয়! ওরে কাছে আয়, চলে আয়, ছুটে আয়।" আমরা বড় বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তার আহবান শুনতে লাগলুম। তার গুরুনাদে প্রাণ আকৃষ্ট হল অথচ একটা অজানিত ভয়ে যেন স্তম্ভিতও হল! কিন্তু সে উন্মাদ আহবানের আকর্ষণী শক্তি আর সব রকম ভাবকে ছাড়িয়ে উঠল, আমরাও উন্মাদ আগ্রহে, উন্মাদ আনন্দে অগ্রসর হতে লাগলুম। কতদূর থেকে তার আহবান শুনতে পেয়ে ছিলুম, কিন্তু তার কাছে - একেবারে নদী কিনারায় পৌঁছতে কত বিলম্ব হল। সে ক্ষীণ রেখে ক্রমে প্রশস্ত হতে লাগল, কিন্তু তখনও যেন মাটীর উপর হাত দুই তিন চওড়া খানিকটা পারা ভাসছে, ক্রমে আরও প্রশস্ত ও স্পষ্টতর হল, ক্রমে খুব ভাল করে দেখা গেল, ক্রমে সবটা দেখা গেল তবু তার ধারে গিয়ে পৌঁছতে পাচ্ছিনে, পথ যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে।

যাহোক্ সে বস্ত্রের শেষ না থাক্ পথের শেষ ক্রমে দেখা গেল, আমাদের ঈপ্সিত লাভ হল, রঙ্গিতের তীরে এসে দাঁড়ালুম, - সে যে ছবি চোখের সুমুখে খুলে গেল। দেখলুম রাশি রাশি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়ে তরঙ্গিনী ফেনিয়ে ফুঁসিয়ে লাফিয়ে গর্জ্জিয়ে চলেছে। প্রস্তর রাশি মূক প্রহরীর মত তার পথ রোধ করে রয়েছে। সুন্দরী অভিমানিনীর কত আঘাত, কত লাঞ্ছনা, কত তিরস্কার, - সব তারা ঘাড় পেতে সয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু কর্ত্তব্যে অটল, - এতটুকু স্থানভ্রষ্ট হচ্ছে না, তরঙ্গিনী মহা রাগভরে তাদের মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে ছিটকিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।

এও নদী, গঙ্গাও নদী, কিন্তু দুয়ে কত প্রভেদ - গঙ্গা যেমন প্রৌঢ়া শান্তি, এ যেন শুধু তরুণ ঝাঁঝ, কেবলি ঝাঁঝ। এই জলপ্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে কে বলতে সাহস করবে এ শুধু জড় অচেতন পদার্থমাত্র, এর প্রাণ নেই, চেতনা নেই, আত্মা নাই। যে চেতনা যে আবেগ, যে অভিমান এই দুটো বাষ্প মিশ্রণের প্রতি কণা বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হচ্ছে পঞ্চভূতের সমষ্টিতে তার তুলনা কোথায়? এই যে ফেণকুণ্ডলা, ভীষণ নির্ঘোষময়ী কুপিতা সুন্দরী তটিনী এর তুল্য প্রাণময়ী কোন মানবীকে দেখা গেছে? যে মৌন পাষাণখণ্ড তার বিশাল বক্ষের উপর কল্লোলিনীর সমস্ত অত্যাচার অবিকৃত ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন করছে তার ভিতরেও চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন সঞ্চার কে না উপলব্ধি করবে? আমরা পুলকিতহৃদয়ে, অনন্যমনে এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম।

আমরা প্রথমে মন্দ গতিতে পরে ক্রমশঃ গতি বাড়িয়ে আলো ও ছায়ার ভিতর দিয়ে চলতে লাগলুম! তখনও রোদ পড়েনি, কিন্তু রোদের প্রখরতাও তেমন নেই। ঘোড়া ছোটাতে সইসরা পিছনে পড়ে গেল, আমরা তাদের জন্যে অপেক্ষা না করে মাইল ষ্টোন অনুসরণ করে চলতে লাগলুম। কিন্তু এ বেলা যেন এক একটা মাইলকে ওবেলার চেয়ে ঢের বেশী লম্বা মনে হতে লাগল - প্রায় আধঘন্টায় একটি করে মাইল অতিক্রম কর্ত্তে লাগলুম - তাহলে এগার মাইল কতক্ষণে পৌঁছব, তাছাড়া মলরোড থেকে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্তও প্রায় আর দেড় মাইল হবে! সূর্য্য দেখতে দেখতে অস্তে গেল, চা-ক্ষেতের সাহেব কুলিদের ছুটি দিয়ে বাড়ীমুখো ফিরলে, পাল পাল বস্তার ঘোড়া আমাদের পথ রোধ কর্ত্তে লাগল, - তাদের মালিকরা সঙ্গে সঙ্গেই আছে। একজায়গায় একজন যুবক টী প্ল্যান্টার আমাদের পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, তার দুটী ছোট ছোট কুকুর তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে। একটা বাঁক ফিরতে কুকুরদুটী অনেকগুল বস্তার ঘোড়ার মাঝে পড়ে গেল, যে দিকে যাবে সেই দিকেই ঘোড়ার পায়ে মাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা, প্ল্যান্টার তার নিজের ঘোড়া থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে একটা কুকুরকে কোলে তুলে নিলে, অন্যটাকে

উঠাতে পারলেনা। ঘোড়ার হিন্দুস্থানী মালিককে হিন্দিতে নরম কথায় কুকুরটাকে তার কোলের উপর উঠিয়ে দিতে বল্লে। মেড়ুয়াবাদীর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। আমার এমন রাগ ধরল, ছোট কুকুরটী অতগুল ঘোড়ার পায়ের মধ্যে পড়ে ভয়েই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, কোন্‌দিকে নড়বে কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা, তার বিপদও সমূহ, আর কাটখোট্টা মানুষটা দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে তাই দেখছে, একটু হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে প্ল্যান্টারের কোলে তুলে দেবে তা না। আমি তার ব্যবহার দেখে কিছু রূঢ়ভাষায় তাকে সাহেবের কুকুর বাঁচাতে বল্লুম, তখন সে শুনলে। প্ল্যান্টার ত আমার প্রতি ভারি কৃতজ্ঞ, আমি ঘোড়াওয়ালাকে আমার বক্তব্য বলে এবং সেটা পালন হচ্ছে দেখেই ভিড়ের মধ্যে থেকে নিজের ঘোড়া বের করে নিয়ে, খোলা জায়গায় খানিকটা ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। খানিক পরে দেখি প্ল্যান্টার তার ঘোড়া ছুটিয়ে আমাকে ধরবার চেষ্টা করছে, আমার কাছে এসে নিতান্ত মিষ্ট ভাষায় তার কৃতজ্ঞতা জানালে - আমিই তার কুকুরকে বাঁচিয়েছি - ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এত সামান্য কাজের জন্যে এত ধন্যবাদ পেয়ে আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে তার নগণ্যতার সাপক্ষে দু এক কথা বলতে চেষ্টা করলুম। তার পরে তার সঙ্গে "Good bye" করে আমি অগ্রবর্ত্তী হলুম, সে তার বাঙ্গলাভিমুখে ঘোড়া ফেরালে।

এদিকে যে একটী বিষম গোলযোগ বেধেছে সে কথা এতক্ষণ বলতে অবসর পাইনি। শ্রীযুক্ত সদানন্দের ঘোড়া আর চলতে পারে না, প্রথমে তার পেটী ছিঁড়ে গেল, সেই প্ল্যান্টারের সাহায্যে তিনি সেটা কতকটা দোরস্ত করে নিলেন, কিন্তু তাঁর দেহভার বহন কর্ত্তে সে এখন আর নিতান্তই অক্ষম। তিনি আবার ভায়ার ঘোড়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে অদলবদলের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সে এবারে কিছুতেই রাজী হয় না - সে বলে "আস্‌বার সময় মাঝে মাঝে তোমাকে বওয়াতেই আমার ঘোড়া হয়রাণ হয়ে গেছে, এখন আবার তা করলে এও আর এক পা নড়তে পারবে না।" কাজে কাজেই তাঁকে নিজের ঘোড়ার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর কর্ত্তে হল। প্রথম মাইল দুই তিন আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলুম, কিন্তু আর ছোটাতে পারছিনে, বেচারারা বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমি সবচেয়ে লঘুভার, তাই আমার ঘোড়ার অবস্থা তবু ভাল, কিন্তু তাহলেও রাস্তাটা আগাগোড়া চড়াই, তাই সে বেচারিও দু চার পা করে উঠেই ধুঁকে পড়ছে, আমি তখন তাকে খানিকক্ষণ দাঁড় করিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, তার প্রতি অনুকম্পাসূচক দুটো মিষ্টি কথা বলে ফের অগ্রসর হচ্ছি। দু একবার এই রকম করবার পর আমার মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল, আমার এই নিরীহ আচরণে প্রভু সদানন্দের ক্রোধবহ্নি হঠাৎ ভয়ানক প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাঁর ঘোড়ার অবস্থা নিতান্ত করুণরসাত্মক, তারই উপর আবার তার প্রভুর কিলটা চাপড়টাও চলছে, কিন্তু তাতেও কিছু ফলোদয় হচ্ছে না - সদানন্দের মনের তখন নিতান্ত ঝালাপালা অবস্থা, সেই সময় ঘোড়ার সঙ্গে আমার মিষ্টালাপটা তাঁর কি রকম অসহ্য হয়ে উঠল। কল্পনা কর একটা মুক্ত পার্ব্বত্য প্রান্তর, তার থাকে থাকে রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে, তারই একটীর উপর তিনটী বিদেশী বিপন্ন অশ্বারোহী যুবক, একজন মহাক্রুদ্ধ, একজন মহাহাস্যপরায়ণ আর একজন নির্ব্বিবাদী, নিশ্চেষ্ট। প্রভু যত আমার উপর রাগ করেন আমার হাসির লহরী তত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আমি তাঁকে তত বোঝাতে চেষ্টা পাই আমি কি অপরাধটা করলুম? আমার ঘোড়াকে কেন আমি মায়া করছি, তাকে কেন জিরোতে দিচ্ছি - সেইটেই আমার অপরাধ। কিন্তু আমার ঘোড়ার প্রতি অনুকম্পার সঙ্গে তাঁর ঘোড়ার চলৎশক্তিরহিত্বের যে কোথায় যোগ আমি সেটা কিছুতেই ধর্ত্তে পারলুম না। আমি দ্বিতীয় নম্বর অপরাধ এই করেছিলুম যে একটা খোট্টা ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে পথে আলাপ পরিচয় করছিলুম; সে কোথা থেকে আস্‌ছে, কন্দুর যাবে, পাহাড়ে কবছর আছে, কিসের চাষ করে, কেমন পোষায়, এবম্বিধ অনেক প্রশ্ন করছিলুম, এবং অবিশ্যি আমাদের সম্বন্ধে তারও কতক কতক কৌতুহল নিবৃত্ত কর্ত্তে হয়েছিল। মদগ্রজের বিশ্বাস সে লোকটা ঘোর মাতাল, আমরা কিন্তু তাতে মাতালের কোন লক্ষণ দেখতে পাইনি। আবার এক সময়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল আমরা পথ হারিয়েছি, আস্‌বার সময় যে পথ দিয়ে এসেছিলুম এ সে পথ নয়। এ যে সেই পথ সে বিষয়ে আমার তিল মাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে রাস্তায় একজন ভুটিয়াকে দেখতে পেয়ে তাকে পথ জিজ্ঞাসা করলুম। সে জায়গাটাতে দুটো শাখা রাস্তা বেরিয়েছে, ভুটিয়া আমাদের দার্জ্জিলিংয়ের আসল রাস্তাটা দেখিয়ে দিলে। আমিও জান্‌তুম যে সেই আসল রাস্তা, - আমার পথের দৃশ্য বেশ মনে ছিল - কিন্তু সদানন্দ ঠাকুরের কিছুতেই ভুটিয়ার কথায় বিশ্বাস হয় না, তিনি আমাকে বলতে লাগলেন " তোমার যেমন কাণ্ড, ওকে রাস্তা জিজ্ঞেস কর্ত্তে গেছ, ওরা সব চোর, ও নিশ্চয় একটা মন্দ রাস্তা বলে দিয়েছে, ওদের আড্ডায় নিয়ে গিয়ে, আমাদের মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা।" তিনি কিছুতেই সে রাস্তায় যাবেন না। অথচ আমাদের দুজনের স্থির বিশ্বাস ঐটেই ঠিক রাস্তা, বরঞ্চ অন্য রাস্তায় গেলেই পথ হারাব, তাই ভুটিয়ানির্দ্দিষ্ট পথে যাওয়াই আমাদের দৃঢ়সংকল্প। শেষকালে তিনি কি করেন, আমাদের জেদ দেখে অগত্যা তাঁকে আমাদের সঙ্গ নিতে হল, কিন্তু বরাবর বলতে বলতে চললেন "কক্ষণো এ রাস্তা দিয়ে আমরা সকালে আসিনি, ও নিশ্চয় চোর, আমাদের ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে।"

ইতিমধ্যে চাঁদ উঠেছে, অত্যন্ত পরিষ্কার জ্যোৎস্না, কিন্তু কখন যে দিনের আলো চলে গেল, চাঁদের আলো তার স্থান নিলে আমরা কিছু জানতে পারিনি, আমাদের বাইরের প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা অনুভব করিনি। জ্যোৎস্নায় সেই পার্ব্বত্য প্রকৃতির যে কেমন শোভা হয়েছিল তা দেখ্‌বার আমাদের তিলমাত্র অবকাশ ছিল না, সদানন্দের মেজাজ বিগড়ে যাওয়াতে আমরা এমনি বিব্রত হয়ে ছিলুম। সেই সময়টা ভুটিয়াদের ঘরে ঘরে দশহারা উৎসব, তারা তখন ভয়ানক মাতাল হয়ে থাকে শোনা ছিল, তাই ভুটিয়া বস্তির নিকটবর্ত্তী হবার সময় সদানন্দের সশঙ্কিতাবস্থার কথা আর কহতব্য নয়। প্রত্যেক কুটীরটা অতিক্রম করছেন আর মনে করছেন একটা ফাঁড়া কাট্‌ল। হঠাৎ একটা বাড়ী থেকে একটা লম্বা, ঝোলা, কাল কাপড়পরা ভুটিয়া বেরিয়ে এল, মাটিতে তার ছায়া ভয়ানক দীর্ঘ দেখাতে লাগ্‌ল, সদানন্দ প্রতি মুহূর্তে মনে কর্ত্তে লাগ্‌লেন বুঝি আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করার জন্যে সে আমাদের গলায় কুক্‌রি বসিয়ে দেয়। তাঁর ভয় আমাদের মনেও কিছু সংক্রামক হল। কিন্তু সে ভুটিয়া নিঃশব্দে আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আমরাও নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিতান্ত স্বচ্ছন্দতার ভান করে ঘোড়া চালাতে লাগ্‌লুম। এবার দার্জ্জিলিঙের আলো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু দার্জ্জিলিঙ এখনও দূরে। এদিকে মাইল কতক আগে সদানন্দের ঘোড়ার পেটি ফের ছিঁড়ে গেছে, তার পিঠে সাজ আর শক্ত করে বসান যায় না। ঘোড়া তাঁকে বহন না করে তাঁকে ঘোড়াকে বহন করে আনতে হচ্ছে। হরি হরি, যে প্রভাতে রঙ্গিৎ যাত্রা করেছিলুম সে কি আজকেকারই প্রভাত! সে যেন কত দিনকার স্বপ্ন-কথার মত মনে হচ্ছে, - সে আনন্দ, আমাদের তিনটী সহযাত্রীর সে সদ্ভাব এখন কতদূরে। তাঁর ঘোড়া নিয়ে যত বেগ পেতে হচ্ছে, সদানন্দ আমাদের উপর ততই চট্‌ছেন, যেন আমাদের দোষেই তাঁকে এই বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে। তাঁর স্থায়ী অপ্রসন্নতায় শেষাশেষি আমারও হাস্যোচ্ছ্বাস বন্ধ হল, বাড়ী পৌঁছিয়ে এই অপ্রসন্ন খিটখিটে সঙ্গীটির সঙ্গ ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্যে মন উচাটন হল। মলরোড পাওয়া গেল, হাঁফছেড়ে বাঁচলুম! তারপরে বাড়ী পৌঁছন আর বেশী ক্ষণের কথা নয়। আমরা ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়েছিলুম, রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে ফিরে এলুম। ছটী শ্রান্ত পথক্লিষ্ট প্রাণী, - তিনটী মানুষ ও তিনটী অশ্ব, বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালুম। আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা আমাদের ফিরতে এত বিলম্ব দেখে উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমাদের প্রতীক্ষা করে সকলেই দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দর্শনপ্রাপ্তিমাত্রে সব ভাবনা দূর হল। আমরাও ঘোড়ার থেকে নেমে বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গোতেই যেন আমাদের সব পথশ্রম কেটে গেল, আর আমাদের পরস্পরের প্রতি মনের গ্লানিও এক নিঃশ্বাসে ছুটে গেল। তখন গল্প করার মহাধূম!

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি আমাদের দুটী সঙ্গী নিরুদ্দেশ - এঁরাই আমাদের রঙ্গিৎ যাওয়ার বিষয়ে বিশেষ নিরুৎসাহ করেছিলেন। সন্ধান নিয়ে জানলুম আমরা সকালে যাত্রা করা অবধি এঁদেরও যাবার ইচ্ছা এমন বলবতী হয়ে উঠেছিল যে সেই দিনের মধ্যেই বাহনের বন্দোবস্ত ঠিক করে, তারপর দিন ভোরে চুপি চুপি যাত্রা করেছেন। আমাদের লুকিয়ে যাওয়ার অর্থ আমাদের চমৎকৃত করা। এঁরা বাস্তবিক আমাদের হারিয়েছিলেন - রঙ্গিতে স্নান করেছিলেন। তাঁরা যখন ফিরে এসে সে গল্প করলেন তখন তাঁদের জানতে দিলুম না যে আমরা সেটাকে বিশেষ একটা কিছু কীর্ত্তি মনে করছি, কিন্তু মনে মনে দুঃখে অনুতাপে মরে রইলুম। কিন্তু সে শুধু আমরা দুটী - আমি ও কনিষ্ঠ। শ্রীশ্রীসদানন্দ মহাপ্রভুর তখন এসব সেন্টিমেন্টের অবসর ছিল না, তাঁকে তখন আর এক খবরে বিশেষ কাবু করেছে, - তাঁর অশ্বরাজ কিছু দানা উদরস্থ করছে না, তার আশু পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, ঘোড়াওয়ালা চারটাকার বদলে নাকি শখানেক টাকা দাবী করবে! প্রভুর চক্ষুস্থির! আমরা পরম আমোদিত!!

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ জাতীয় গ্রন্থাগার

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (পঞ্চম পর্ব)

আগের পর্ব - এবার কাহিনি কেদারনাথের

গঙ্গোত্রীর পথে

সুবীর কুমার রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

রাস্তায় একরকম ছোট ছোট ঝোপ হয়ে আছে। তাতে অজস্র ছোট ছোট, লাল লাল, করমচার মতো ফল ধরেছে। স্থানীয় লোকেরা দেখি টপাটপ ওই গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে মুখে পুরছে। আমরাও কয়েকটা ফল তুলে খেলাম। বোধহয় পাহাড়ি করমচা। যত বাইপাস চোখে পড়ছে, ব্যবহার করে বেশ দ্রুত নেমে আসছি। গতকাল যাওয়ার সময় একটা গুহা মতো পাথরের খাঁজে, একটা উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। সামনে কয়েকটা ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙিয়ে, গায়ে ছাই মেখে বসে ছিল। পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখ পিটপিট করে দেখছিল। এখন ফেরার পথে তার কাছাকাছি আসতে, দিলীপ আর মাধবের কাছে পয়সা চাইল। ওরা কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল। একটু পিছনেই আমি। আমার কাছেও পয়সা চাইল। আমিও কিছু না দেওয়াতে, বেশ কড়া সুরে অভিশাপ দেবার ভঙ্গিতে আমায় বলল –"তুই যেমন আছিস, তেমন থাকবি"।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। যাবার সময় কিছু বলে নি। ভেবেছিল এপথে ফিরতে তো হবেই, ট্যাক্সটা তখনই আদায় করা যাবে। দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম বেশ দু'ঘা দিয়ে ব্যাটাকে ওপর থেকে নীচে ফেলে দিই। মাধব এগিয়ে এসে কিছু বলতে বারণ করল। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। বাইপাস ব্যবহার করে বেশ দ্রুত ফিরছিলাম। কিন্তু আরও শর্টকাট করতে গিয়ে মহা বিপদে পড়লাম। বাইপাস নয়, এমন একটা পায়ে চলা রাস্তার মতো দাগকে বাইপাস ভেবে, হাত দিয়ে লতাপাতা সরিয়ে হাঁটতে গিয়ে, ডান হাতের কব্জির কাছ থেকে কনুই পর্যন্ত মোক্ষম বনবিছুটি লাগল। মনে হল ভীষণ জোরে ইলেকট্রিক শক্ খেলাম। অল্প সময়ের মধ্যে শক্ত হয়ে ফুলে উঠল। মনে হচ্ছে হাতের দু'দিক থেকে দু'জন যেন চামড়াটা দু'দিকে টানছে। গোটা জায়গাটা গরম হয়ে ভীষণ কষ্টকর যন্ত্রণা শুরু হল। একজন স্থানীয় বৃদ্ধ কাছেই একটা পাথরের ওপর বসেছিল। কী ভাবে জানিনা, সে কিন্তু বুঝে গেছে যে আমার বিচ্ছু লেগেছে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম কী করব। সে বলল, হাতের ক্ষত জায়গায় পিসাব কর দেও। এখন এই মুহূর্তে সেটা করা সম্ভব নয়। তাই আস্তে আস্তে সাবধানে রাস্তায় ফিরে এসে, হাতে ভালভাবে বোরোলীন লাগালাম। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রামওয়াড়া চটিতে এসে উপস্থিত হলাম। স্থানীয় কী একটা উৎসবের জন্য, পুরুষ আর মহিলারা নেচে নেচে টাকা পয়সা, চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি আদায় করছে। চা বিস্কুট খেয়ে, বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাতে বিছুটি লেগেছে কী করব? সে বললো কিছু হবে না। যা-ই লাগান না কেন, আজ যখন লেগেছে কাল সেই সময় কমে যাবে। অর্থাৎ পুরো একদিন যন্ত্রণা থাকবে। আঁতকে উঠে ভাবলাম পুরো চব্বিশ ঘন্টা এই যন্ত্রণা আমার সঙ্গী হলে হয়েছে আর কী। উঠে পড়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। দিলীপ অনেক এগিয়ে গেছে, মাধবের হাঁটুর ব্যথাটা বেশ বেড়েছে। ওর সঙ্গে তাল রেখে ধীরে ধীরে নামছি। ক্রমে ওর হাঁটার গতি এত কমে গেল যে, ইচ্ছা না থাকলেও এগিয়ে গেলাম। একটু এগিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করে, আবার ওর সঙ্গে একটু হাঁটলাম। আবার এগিয়ে গেলাম। এইভাবে একসময় গৌরীকুণ্ডে এসে, পরিচিত সেই দোকানে গিয়ে বসলাম। দিলীপ আগেই এসে গেছে। মাধব একটু পরেই এসে হাজির হল।

চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানদারকে বললাম, আমরা আজই উত্তরকাশী যাবার বাস ধরতে চাই, কখন পাব? দোকানদার জানালেন, বিকেল পাঁচটায় শেষ বাস পাওয়া যাবে। দাম মিটিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এলাম। আর কোনো প্যাসেঞ্জার না থাকায়, আমাদের তিনজনকে নিয়ে কোনো ট্যাক্সি যেতে রাজি হল না। আরও অন্তত দু'তিনজন প্যাসেঞ্জারের প্রয়োজন। কিন্তু কেউ আর আসে না। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে উত্তরকাশীর বাসের কথা জিজ্ঞাসা করতে সে জানাল, উত্তরকাশীগামী শেষ বাস শোনপ্রয়াগ থেকে বিকাল পাঁচটায় ছাড়ে। হাতে অনেক সময় আছে, তাই দু'তিনজন প্যাসেঞ্জারের আশায় তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে রইলাম। একজন টাকমাথা, বেঁটে, মোটা মতো মাঝবয়সী ভদ্রলোক শোনপ্রয়াগ যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে হাজির হলেন। কেদারনাথ থেকে আরও যদি কেউ আসে, সেই আশায় ট্যাক্সি ড্রাইভার তবু দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে নতুন কোন যাত্রী না পাওয়ায়, আমাদের চারজনকে নিয়েই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। মাধব আমার পাশে, তার পাশে ওই নতুন ভদ্রলোক। মাধব জানালো যে তার পায়ের ব্যথাটা বেশ বেড়েছে, সঙ্গে জ্বরও এসেছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বললাম শোনপ্রয়াগ গিয়ে সঙ্গে আনা ওষুধ দেওয়া যাবে। ভদ্রলোক পাশ থেকে বললেন, আমায় বলুন না, ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ ব্যাগ হাতড়ে খুঁজেপেতে একটা ট্যাবলেট বার করে বললেন, চট করে গিলে ফেলুন। মাধব আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে, চোখের ইশারায় ট্যাবলেটটা খেতে বারণ করলাম। ভদ্রলোকের আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত রকমের, তার ওপর ওষুধটার নামও আগে কখনও শুনিনি। মাধব তাঁকে বলল, খেয়ে নিয়েছে। ভদ্রলোক বললেন, তিনি বদ্রীনারায়ণ যাবেন। আমরা তাঁকে কীভাবে বদ্রীনারায়ণ যেতে হবে, সেখানে কী কী দেখার আছে, সব জানালাম। ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, যদিও এই তাঁর প্রথম বাইরে বেড়াতে আসা, তবু তিনি কল্পনার চোখে সব দেখতে পাচ্ছেন, কারণ তিনি শিল্পী, ছবি আঁকেন। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ তিনি প্রস্তাব দিলেন, শোনপ্রয়াগে আমাদের সঙ্গে তিনি একই জায়গায় থেকে যেতে চান। তাঁর সঙ্গে এক জায়গায় থাকার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নেই। তার ওপর আজই আমরা উত্তরকাশীর উদ্দেশ্যে রওনা দেব। তাঁকে বললাম, আজই আমরা সন্ধ্যার বাসে চলে যাব, কাজেই একসঙ্গে থাকার কোন সুযোগ নেই। অবশেষে শোনপ্রয়াগে পূর্বপরিচিত জায়গায়, ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

বাসের টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। মাধব গেল মালপত্রগুলো পোষ্ট অফিস থেকে ছাড়াতে। হায়! কাউন্টারে এসে জানতে পারলাম, আজ কোনও বাস নেই। কাল সকাল পাঁচটায় প্রথম বাস ছাড়বে। সেই টেহেরি গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর পর্যন্ত ওই বাসে গিয়ে, ওখান থেকে উত্তরকাশীর বাস পাওয়া যাবে। গত বছর বন্যার আগে এই সমস্ত রাস্তায় "যাত্রা বাস" বা ডিরেক্ট বাস সার্ভিস ছিল। এখন প্যাসেঞ্জারের অভাবে বাতিল হয়েছে। ফলে সময় ও খরচ দু'টোই অনেক বেড়ে গেছে। কষ্ট তো বেড়েইছে। কাউন্টারে জানালাম, গৌরীকুণ্ডে এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে আমরা শুনেছি যে বিকাল পাঁচটায় লাষ্ট বাস পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক বললেন, ওরা ভুল বলেছে, সকাল পাঁচটায় ফার্ষ্ট বাস পাওয়া যাবে। অহেতুক আজ শোনপ্রয়াগে এলাম। এখানে না পাওয়া যায় ভাল খাবার, না পাওয়া যায় ভাল থাকার জায়গা। গৌরীকুণ্ডে রাতে থাকলে, অনেক আরামে থাকা যেত।

টিকিট কাউন্টারের বাঁপাশে একটু ওপরে, একটা ভাল থাকার জায়গা পাওয়া গেল। কিন্তু এখানে আবার খাটিয়া পাওয়া গেলেও, আলাদা ঘর পাওয়া যাবে

না। অগত্যা আবার সেই পোষ্ট অফিসের পুরাতন ঘরটায় রাতের আশ্রয় নিতে হল। আগেরবার যে ঘরটায় মোটা যুবক ও তার বৃদ্ধ সঙ্গীটি আশ্রয় নিয়েছিল, সেই ঘরটায় একটা দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার রয়েছে। এদের লোক সংখ্যা অনেক। সঙ্গে আবার একগাদা বাচ্চা। কান্নার আওয়াজ সব সময় লেগেই আছে। আমাদের পিছনে, মাঝখানে খানিকটা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা যে ঘরটি আছে, সেখানে কয়েকজন যুবক এসে জায়গা নিয়েছে। এদের সঙ্গে ট্যাক্সির সেই আর্টিষ্ট ভদ্রলোক কিভাবে ম্যানেজ করে ঢুকে গেছেন। সবকটা যুবকই খুব আধুনিক ধরণের, এসেছে কলকাতা থেকে। আর্টিষ্ট ভদ্রলোক দেখলাম তাদের খুব বড় বড় কথা বলে চলেছেন। তারাও খুব চতুরতার সঙ্গে তাঁকে ব্যঙ্গ করছে, 'মুরগি' করছেও বলা যেতে পারে।
মাধবের গায়ে মোটামুটি ভালই জ্বর আছে। ওকে বেরোতে বারণ করে, আমি আর দিলীপ ঘরে মালপত্র ভালভাবে গুছিয়ে রেখে, বাইরে এলাম। এখানে ঠাণ্ডা খুব একটা বেশি নয়। আগের দোকানে রাতের সেই একই খাবার খেয়ে, অপর একটা দোকানে মগ নিয়ে গেলাম মাধবের জন্য দুধ কিনতে। দোকানদার জানালো দুধ নেই, পাওয়া যাবে না। বললাম, এক বন্ধুর বেশ জ্বর, একটু দুধ না পেলে সারারাত তাকে না খেয়ে থাকতে হবে। সব শুনে দোকানদার কিন্তু এবারে অন্যরকম ব্যবহার করল। বলল, গায়ে জ্বর? তাহলে অসুবিধা হলেও একটু দুধ তো দিতেই হয়। দুধ গরম করতে করতে, কী কী ওষুধ খাওয়ানো প্রয়োজন, বা কী কী করা উচিত, নিজে থেকেই বলতে শুরু করে দিল। চায়ের জন্য রাখা সামান্য দুধ থেকেও, কিছুটা দুধ গরম করে আমাদের মগে ঢেলে দিল, শুধু একজন অসুস্থ লোক না খেয়ে থাকবে বলে। এদের সরলতা, আন্তরিকতা বা মনুষ্যত্ব দেখলে, নিজেদেরকে খুব ছোট মনে হয়। আমাদের এখানে শুধু লোক ঠকানো ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করা ছাড়া আর কিছুই শিখলাম না। যাহোক, ঘরে ফিরে এসে গরম দুধে কিছুটা বোর্নভিটা দিয়ে মাধবকে দিলাম। সঙ্গে নিয়ে আসা ওষুধ থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধও দিলাম। মাধব বলল, দুধটা খুব ভাল। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।
পাশের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে ঘরটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। আমাদের ঘরটা অন্ধকার, তাই পাশের ঘর থেকে আমাদের দেখার কোন সুযোগ নেই। দেখলাম একটা মদের বোতল খুলে সবাই গোল হয়ে বসেছে। আর্টিষ্ট ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, তাঁর চলে কী না। আর্টিষ্ট বললেন, তাঁর অভ্যাস নেই। আরও বললেন যে, তাদেরও এত খাওয়া উচিত হচ্ছে না। কিন্তু বোতলটা নিয়ে কথা বলতে বলতে, বেশ কয়েকবার অনেকটা করে নিজের গ্লাসে ঢেলে, গ্লাস খালি করলেন। মাধব বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ঘুম আসছে না। উপুড় হয়ে শুয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করতে লাগলাম। ভদ্রলোককে একজন জিজ্ঞাসা করল, এপথে তিনি আগে কখনও এসেছেন। উত্তরে আর্টিষ্ট বললেন, এপথে তিনি এই প্রথম, তবে কল্পনার চোখে তিনি এসব জায়গার ছবি অনেক স্কেচ করেছেন। এখন বাস্তবে দেখে বুঝছেন, যেরকম ছবি তিনি এঁকেছেন, জায়গাগুলো আসলে তত সুন্দর মোটেই নয়। তাঁর আঁকা কেদারের ছবি, যদিও কল্পনায় আঁকা, তবু হুবহু এক এবং অনেক প্রাণবন্ত। যুবকরা বলল, "আপনার মধ্যে এরকম প্রতিভা লুকিয়ে আছে, আর আপনি সেটা নষ্ট করছেন? আপনাকে দেখলে বোঝাই যায় না, আপনি এত গুণের অধিকারী"। তাদের ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে, ভদ্রলোক আরেকবার কারণসুধা গলায় ঢেলে শুয়ে পড়লেন। যুবকরাও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। রাতের খাবার খেতে যাবার সময় কাল সকালে কোন বাস যাবে খোঁজ নিয়ে এসেছি। গাড়ির নম্বরও নোট করে এনেছি। ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। বলেছে, কাল সকালে বাসের সামনের দিকে তিনটে ভাল সিট আমাদের জন্য রেখে দেবে এবং ভোরে ঘুম থেকে ডেকে তুলেও দিয়ে যাবে। ফলে ঘুম না ভাঙার কোন চিন্তা আর নেই। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে, ফলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

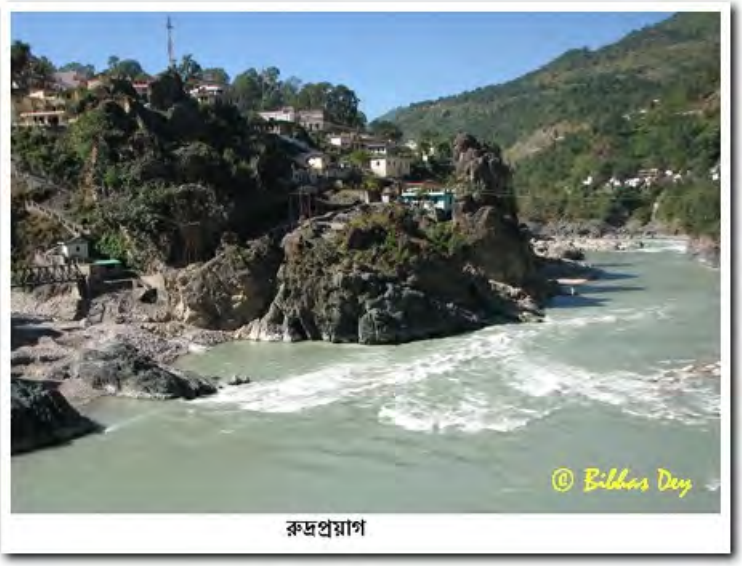

রুদ্রপ্রয়াগ

ছাব্বিশে আগষ্ট। ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ, দিলীপের ডাকে ঘুম ভাঙল। আমাদের কথাবার্তায় পাশের ঘরের ওরাও উঠে পড়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার বোধহয় অনেক আগেই উঠেছে। বাইরে এলাম চায়ের খোঁজে। কোনো দোকান খোলেনি। বাসটাও দেখতে পেলাম না। ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হল। বলল, "আপনারা উঠে পড়েছেন? আমি ঠিক ডেকে দিতাম। বাসে গিয়ে জায়গাটা বরং একটু রেখে আসুন।" খোঁজ নিয়ে বাসে গিয়ে দেখলাম বাস প্রায় ভর্তি। ব্যাটা ড্রাইভার জায়গা রাখেনি। পিছন দিকে তিনজন বসার সিটে জায়গা রেখে এসে দেখি, একটা চায়ের দোকান খুলেছে। অনেক লোকের ভিড়। তিনজনে চা খেয়ে, মুখ হাত ধুয়ে, বাথরুম সেরে, পোষ্টঅফিসের মালিককে ভাড়া মিটিয়ে, বাসে ফিরে এসে জায়গায় বসলাম। আমাদের ঠিক সামনের তিনজন বসার সিটে, একজন বৃদ্ধ ও একজন বৃদ্ধা পরম সুখে বসে আছেন। বাসে বেশ ভিড়, ফলে অনেকেই ওখানে বসতে চায়। কেউ ওখানে বসতে চাইলেই, বৃদ্ধ দম্পতি জানাচ্ছেন, এখানে একজনের জায়গা আছে। কার জায়গা আছে বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা গেল বাস ছাড়ার পরে, কন্ডাক্টর যখন একজনকে ওখানে বসাতে গেল। জানা গেল যে ওদের পায়ের কাছে, দুই সিটের মাঝে, একজন মহিলা শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘুম ভাঙলে তাকে ওখানে বসানো হবে। বাসের সব লোক হেসে উঠতে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা কিরকম বোকা বোকা মুখে বসে রইলেন। সত্যিই এরা অদ্ভুত মানুষ। আমরা একত্রিশ টাকা পঁচানব্বই পয়সা দিয়ে তিনটে শ্রীনগরের টিকিট কাটলাম। এসব জায়গায় যে কী হিসাবে ভাড়া নেওয়া হয়, স্বয়ং আইনস্টাইনও হিসাব করে বলতে পারবেন না। আজ আমরা কতদূর যেতে পারব জানিনা। বাস গুপ্তকাশী, অগস্ত্যমুনি হয়ে এক সময় আবার সেই রুদ্রপ্রয়াগ এসে পৌঁছাল। আজ যেন মনে হল, রুদ্রপ্রয়াগ নতুন রূপে সেজেছে। সত্যিই জায়গাটা কী অপূর্ব সুন্দর! বাসের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। তিনজনের বসার সিটে, চারজন করে বসছে। কোনরকমে কষ্ট করে শ্রীনগরে এসে পৌঁছলাম। বাস থেকে চটপট নেমে, ছাদে উঠে দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে মালপত্র রাস্তায় নামালাম। হৃষিকেশ থেকে যে জামাপ্যান্ট পরে বেরিয়েছি, সেই পোষাক পরেই আজও আছি। ওই পোষাক পরেই প্রয়োজনে রাস্তায় শুয়ে বসে বিশ্রাম নিতেও হয়েছে। বাসের ধুলোয়, পথের ধুলোয়, তার আগের রঙ ঠিক কিরকম ছিল, মনে করতে পারছি না। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দৌড়ে গেলাম টিকিট কাউন্টারে। মাধব একপাশে দাঁড়িয়ে মালপত্র পাহারা দিচ্ছে। ওর শরীর বেশ খারাপ, বিশ্রামের প্রয়োজন।

গুপ্তকাশী

কাউন্টারে এসে গঙ্গোত্রী যাওয়ার বাসের খোঁজ করলাম। পথে শুনেছিলাম গঙ্গোত্রী যাওয়া যাচ্ছে না। এক বৃদ্ধা জানিয়েছিলেন, বন্ডে সই করে, তবে ওখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে গঙ্গোত্রী যেতে দেওয়া হয়নি। মিলিটারিরা যেতে বারণ করেছিল। সব শুনে ঠিক করেছিলাম, সেরকম অসুবিধা বুঝলে, প্রথমে যমুণোত্রী চলে যাব। তারপর সম্ভব হলে, গঙ্গোত্রী, গোমুখ যাওয়ার চেষ্টা করা যাবে। কাউন্টারের ভদ্রলোক জানালেন, গঙ্গোত্রী যাবার 'যাত্রা বাস' পাওয়া যাবে না। ভদ্রলোক একটা বাসের নম্বর দিয়ে বললেন, "এখনই এই বাসটা ছেড়ে দেবে। চটপট এই বাসে করে টেহেরি চলে যান। ওখান থেকে বাস পাবেন"। কোথা দিয়ে কিভাবে যেতে হবে, সত্যিই এভাবে যাওয়া যাবে কী না, আমাদের কোন ধারণাই নেই। খোঁজ নেওয়ার সময়ও নেই। একজনের মুখের কথার ওপর ভরসা করে, দৌড়ে গিয়ে, নির্দিষ্ট নাম্বারের বাসের ছাদে উঠে, মালপত্র গুছিয়ে রাখলাম। বাসে ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে বসেই ছিল। ছাদ থেকে নেমে দেখলাম, মাধব একটা বসার জায়গা ম্যানেজ করে নিয়েছে। দিলীপও ওর পাশে একটা জায়গা পেয়ে গেল। বাসে খুব ভিড়, ফলে সবার পরে আমি বাসে ওঠায়, আমার বসার জায়গা মিলল না। বাসের অধিকাংশ যাত্রীই, স্থানীয় আদিবাসী বলে মনে হল। এদের দু'একজনকে অনুরোধ করলাম, একটু সরে বসে আমায় একটু বসার জায়গা করে দিতে। কিন্তু কেউ কোন আগ্রহ দেখালনা। সারাদিন খালিপেটে বাস জার্নির পর, দাঁড়িয়ে যেতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। খুব গরম লাগছে। বুক, পিঠ, মুখ, ঘামে ভিজে গেছে। হাফহাতা সোয়েটারটা খুলে ফেললাম। গায়ের এক ইঞ্চি পুরু ময়লার ওপর ঘাম গড়িয়ে লেগে হাত, মুখ, গলা কালো হয়ে গেছে। নিজেকে এই মুহূর্তে নিজেরই ঘেন্না করছে। ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। বাসের সামনের দিকে মাধব আর দিলীপের পাশেই আমি দাঁড়িয়ে আছি। এদিকে কোনও সিট খালি হচ্ছে না। খালি হলেও সঙ্গে সঙ্গে জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে পিছনের দিকের সিটগুলোয়। কিন্তু ভিড় ঠেলে পেছনে যাওয়ারও কোনও উপায় নেই।

এইভাবে পঁচিশ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর, পিছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একেবারে পিছনের সিটে, একটা বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। এই ভিড়ে এখানে একসঙ্গে প্রায় সবাই বিড়ি খাচ্ছে। গরমে, ধোঁয়ায়, নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। তবু মনে একটাই আশা, গঙ্গোত্রীও তাহলে যাওয়া হচ্ছে। বন্ডে সই করে যেতে হবে শুনে রাস্তার বিপদ ও বন্ধুরতার কথা ভেবে, দিলীপ একটু মুষড়ে পড়েছিল, এখন ও কী চিন্তা করছে জানতে ইচ্ছা করছে। তিনটে টিকিট আঠারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে কাটা হল। জলের মতো পয়সা খরচ হচ্ছে। তবু কপাল ভাল গোবিন্দঘাট, যোশীমঠ, ঘাংঘারিয়া, বা নন্দনকানন ও হেমকুণ্ডের পথে পাঞ্জাবীদের দয়ায়, থাকা-খাওয়ার কোন খরচ লাগে নি। অন্যান্য জায়গাতেও দু'তিন টাকার মধ্যে তিনজনের এক বেলার খাওয়া হয়ে গেছে। প্রচণ্ড খিদেয় পেট জ্বালা করছে। এর নামই বোধহয় তীর্থ। এই কষ্ট স্বীকার করলেই বোধহয়, ষোল আনা পুণ্য অর্জন করা যায়। সুন্দর রাস্তার ওপর দিয়ে এখন বাস ছুটছে। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম ধুলোয় ভরা মেঠো রাস্তা দেখছিলাম। এবার দেখছি প্রকৃতির সাজানো বাগানকে ভেদ করে, কী সুন্দর রাস্তাই না তৈরি করা হয়েছে। রাস্তা আরও চওড়া করার কাজও চলছে। বেশ দুপুর নাগাদ বাস টেহেরি পৌঁছাল।

আশ্চর্য, খিদেয় সেই পেট জ্বালা করা ভাবটা আর অনুভব করছি না। বাস থেকে মালপত্র নামিয়ে, দৌড়ে নতুন বাসের খোঁজে গেলাম। শুনলাম সন্ধ্যার আগে উত্তরকাশী যাওয়ার কোন বাস নেই। এদিকে মাধব যেন ক্রমশঃ কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। এত চিন্তার ওপর মাথার ওপর আর এক চিন্তা, বাড়িতে ওর বাবাকে অসুস্থ দেখে এসেছি, এখন আবার ওকে নিয়ে না এখানে কোনো বিপদে পড়তে হয়। একটা জায়গায় মালপত্র জড়ো করে রেখে, কোথায় খাওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় খোঁজ পাওয়া গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বাস যাবে। একেবারে খালি একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে বাসের ছাদে গিয়ে চড়লাম। মালপত্র সাজিয়ে রেখে, একটা হোটেলে গেলাম। জায়গাটা বেশ বড়। একসময় এটা একটা স্বাধীন এস্টেট ছিল। বড় বড় অনেক হোটেল, দোকানপাট আছে। অনেক দিন পরে মনপ্রাণ ভরে মাংস রুটি খেলাম। জানিনা আবার কবে এ সুযোগ আসবে। দাম মিটিয়ে বাসে এসে বসলাম। একবারে সামনের সিটে আমি ও মাধব। ঠিক তার পেছনের সিটটাতে দিলীপ। নির্দিষ্ট সময়েই বাস ছাড়লো। মাধবের গা বেশ গরম, চোখও বেশ লাল। কথা বলার শক্তিও যেন অনেক কমে গেছে। এখনো পর্যন্ত নিজেরাই ডাক্তারি করেছি। জানালার কাচ টেনে দিয়ে, ওয়াটার বটল্ থেকে একটু জল দিলাম, সঙ্গে সেই নিজেদের বুদ্ধিমতো ওষুধ। তিনজনের বাস ভাড়া চব্বিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা মিটিয়ে দিলাম। রাস্তাও অনেকটাই। বাস বেশ জোরে ছুটছে। টেহেরি আসার পথে দেখলাম, একটা বাস গভীর খাদে পড়ে আছে। একটা মোটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাসটাকে ওপরে একটা মোটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে, যাতে বাসটা আর নীচে গড়িয়ে পড়তে না পারে। শুনলাম কেউ মারা যায় নি। ড্রাইভারও লাফিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। আমরাও আমাদের বাসের ড্রাইভারের হাতে নিজেদের প্রাণ সঁপে দিয়ে বসে থাকলাম। একসময় বাস ধরাসু পৌঁছাল। এখান থেকে যমুনোত্রী যাওয়ার রাস্তা বেঁকে গেছে। বাস থেকে নেমে, তিনজনে চা খেয়ে বাসে ফিরে এলাম। একটু পরেই বাস আবার আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল। মনে মনে ভাবছি কখন উত্তরকাশী পৌঁছবে। ওখানে পৌঁছে প্রথম কাজ, মাধবকে ডাক্তার দেখানো। আরও বেশ কিছু পথ পার হয়ে, সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে নিরাপদে উত্তরকাশী পৌঁছালাম।

বাসের ছাদ থেকে মাল নামিয়ে, একটা বাচ্চা ছেলের হাতে মালপত্র দিয়ে, সামনের ট্রাভেলার্স লজে এসে হাজির হলাম। এখানেই একটা ঘর নেওয়া হল। আশ্চর্য, এতবড় বাড়িটাতে আমরাই একমাত্র বোর্ডার। এখানেও সেই আঠারো টাকা ভাড়া। যে ভদ্রলোক ভাড়া নিয়ে রসিদ দিলেন, তাঁকে গঙ্গোত্রী, গোমুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, গত বছরের বন্যায় গঙ্গোত্রীর রাস্তা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাঝখানে তের কিলোমিটার রাস্তা, একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। আগে বাস "লঙ্কা" পর্যন্ত সরাসরি যেত। এখন এখান থেকে বাসে "ভুখি" নামে একটা জায়গা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। ভুখি থেকে তের কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হবে "ডাবরানী" নামে একটা স্থানে। ডাবরানী থেকে আবার লঙ্কা পর্যন্ত বাস পাওয়া যাবে। তবে প্যাসেঞ্জার যথেষ্ট হলে তবেই বাস যাবে। অবশ্য জীপ পাওয়া যায়। এ খবর অনেক আগেই কলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছে এক ভদ্রলোকের কাছে শুনে এসেছিলাম। উনি শুধু এই কারণেই গঙ্গোত্রী যেতে পারেন নি। কলকাতার ইউ.পি.ট্যুরিজম কিন্তু এ খবর জানেই না। আসবার আগে তাদের কাছে এই খবরের সত্যতা জিজ্ঞাসা করলে, তারা একটু ব্যঙ্গ করেই বলেছিল, "কী জানি মশাই, এত বড় একটা খবর আপনারা জানেন, আর আমরাই জানিনা!" যাহোক, মালপত্র রেখে, একটু মুখ হাত ধুয়ে পরিস্কার হয়ে, ট্রাভেলার্স লজের ভদ্রলোকের কাছে ভাল ডাক্তারের খোঁজ করলাম। ভদ্রলোক জানালেন, একটু এগিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের একতলায়, একজন ভাল ডাক্তার বসেন। মাধবকে সঙ্গে করে গেলাম সেই ডাক্তারের খোঁজে। আজ রবিবার, ওই ডাক্তার বসেন না। স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ট্রাভেলার্স লজের পিছন দিকে একটু এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায়, ডাঃ শিব কুমার বসেন। তিনি খুব ভাল ডাক্তার। আমরা তাঁর কাছেই গেলাম। বাড়ির বাইরে নেমপ্লেটে দেখলাম, অনেক ফরেন ডিগ্রি আছে। তাছাড়া উনি কনসালট্যান্ট। অপর কোন ডাক্তারের মাধ্যমে ওঁকে দেখাতে হয়। দরজায় নক্ করলাম, কেউ সাড়া দিল না। দরজায় আবার নক্ করে, একটা বাচ্চা ছেলের কাছে জানা গেল, এখন উনি বাড়িতে নেই। শেষে ওঁর স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন এলে পাওয়া যাবে। স্ত্রীর কথামত রাত্রে আবার গেলাম। ডাক্তার সাহেব তখন রাতের খাবার খেতে বসেছেন। আমাদের একটু বসতে বললেন।

বিকেলবেলা মাধবকে ঘরে রেখে, আমি আর দিলীপ শহরটা একটু ঘুরে দেখে এসেছিলাম। খুব সুন্দর শহর। পাহাড়ের কোলে সবরকম সুযোগ সুবিধা নিয়ে গড়ে উঠেছে। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হল। ভদ্রলোক শিবপুর বি.গার্ডেনের কাছে দু'এক বছর ছিলেন। অদ্ভুত বাংলা বলেন। এখনও পর্যন্ত সব জায়গায় দেখলাম, এখানকার মানুষ মোটামুটি বাংলা বোঝে, অল্পবিস্তর বাংলা বলতেও অনেকেই পারে। শুধু তাই নয়, বাঙালিদের এরা বেশ খাতির ও সম্মান করে। যাহোক ডাক্তার সাহেব খাওয়া সেরে এসে, ডিসপেন্সারির দরজা খুলে, আমাদের ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। সাজানো-গোছানো খুব সুন্দর দু'টো ঘর। সামনের ঘরে সোফাসেট আছে, ওখানে রোগী বা সঙ্গে আসা বাড়ির লোকেরা বসে। ভিতরের ঘরে রোগী দেখা হয়। মাধবকে একটা বেডে শুতে বলে, উনি অনেক রকম ভাবে পরীক্ষা করলেন, প্রেসারও মাপলেন। মাঝবয়সী এই ডাক্তারটিকে রাজপুত্রের মতো দেখতে। কথা বলার কায়দাও খুব। মাধবকে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, প্যারাটাইফয়েড। দিলীপ অনেকক্ষণ থেকেই বলছে রিস্ক না নিয়ে ফিরে যেতে। আমি ভাবছিলাম ওকে

একটু সুস্থ করে যদি গঙ্গোত্রীটা অন্তত ঘুরে আসা যায়। এত কাছে এসে ফিরে যাব? আমরা পাশেই বসে আছি। প্যারাটাইফয়েড শুনে আমি ও দিলীপ নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচায়ি করলাম। আমি খুব আস্তে আস্তে দিলীপকে বললাম, আমাদের ওখানকার ডাক্তারদেরও চট করে প্যারাটাইফয়েড বলার একটা স্বভাব আছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ডাক্তার সাহেব এবার অনেকক্ষণ ধরে মাধবের চোখ ও জিভ পরীক্ষা করে বললেন, যদিও ন্যাচারাল আলো, অর্থাৎ সূর্যালোক ছাড়া সঠিক বলা সম্ভব নয়, তবু মনে হচ্ছে এর জন্ডিস হয়েছে। মরেছে, একেই বোধহয় জন্ডিস কেস বলে। ভয় হল এরপর ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, কলেরা, ইত্যাদি আর পাঁচটা রোগের নাম না একে একে বলে বসেন। শেষে তিনি বললেন, "কাল সকাল পর্যন্ত ওষুধ আমি আমার কাছ থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। এখন আর কোথায় ওষুধ কিনতে যাবেন? এগুলো খেলে খিদে হবে, জ্বরও কমে যাবে। কাল সকালে আবার একবার এসে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন"। কাল সকালেই আমাদের ভুখি যাবার কথা। সকাল সাতটায় বাস। ওঁকে সব খুলে বললাম। সব শুনে উনি বললেন, আগামী কাল না যাওয়াই ভাল। কাল সকালে উনি যদি দেখে বোঝেন, তবে পরশু যাওয়া যেতে পারে। কত ফীজ দেব জিজ্ঞাসা করায়, উনি বললেন, আমি এইভাবে ডিরেক্টলি রোগী দেখি না। আপনারা ট্যুরিষ্ট, যাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন, তাই দেখে দিলাম। যদিও রাতে আমার ফীজ কিছু বেশি, তবু আপনারা ওই সকালের চার্জ, অর্থাৎ পনের টাকাই দিন। আমরা তাঁকে কুড়ি টাকা দিতে, উনি দশ টাকা রেখে বললেন, খুচরো নেই, কাল সকালে দিয়ে দেবেন।

বাইরে এসে একটা হোটেলে খেয়ে নিয়ে, মাধবকে একটা দোকানে দুধ, পাঁউরুটি খাইয়ে, লজে ফিরে এলাম। মাধব শুয়ে পড়লো, আমি ও দিলীপ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে, চিঠি লিখলাম। আগামীকাল সকাল সকাল ওঠার কোন তাড়া নেই। মনে শুধু একটাই চিন্তা, তাহলে কী শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়েও হল না? আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাধবের গায়ে হাত দিয়ে মনে হল জ্বর নেই। মনে মনে ঠিক করলাম, ওকে উৎসাহ দিয়ে, সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েও, গঙ্গোত্রী-গোমুখ যাবই। দরকার হলে ওকে কান্ডি বা ডান্ডিতে নিয়ে যাওয়া যাবে। ভুখি থেকে ডাবরানী, এই তের কিলোমিটার পথ খচ্চরে করে নিয়ে যাব। রাতে ট্রাভেলার্স লজের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখানে মালপত্র রেখে যাওয়ার খরচ কী রকম? ভদ্রলোক বলেছিলেন, পার লাগেজ পার ডে, এক টাকা ভাড়া। কত টাকা লাগেজের জন্য খরচ হতে পারে, হিসেব করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাতাশে আগষ্ট। ঘুম ভাঙল যথারীতি বেশ সকালেই। মাধবের গায়ে জ্বর নেই, শরীরও অনেক সুস্থ। বাইরের ঘেরা জায়গায় এসে চা খেলাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সকাল ন'টায় একটা বাস আছে বটে, তবে সেটা "ভাটোয়ারী" নামে একটা জায়গা পর্যন্ত যাবে। ওখান থেকে ভুখি অল্প কয়েক কিলোমিটার পথ। এখান থেকে সকাল সাতটার বাসটাই একমাত্র সোজা ভুখি পর্যন্ত যায়। সাতটার বাস ধরার কোনও সুযোগ নেই। ন'টার বাসটা ধরতে গেলেও, তৈরি হওয়া দরকার। দিলীপকে পাঠালাম মাধবকে সঙ্গে করে ডাক্তারের কাছে। ওকে বললাম আজ সকাল ন'টার বাসটায় আমরা যেতে চাই জানিয়ে, প্রয়োজন মতো ওষুধপত্র নিয়ে আসতে। আমি একটা হোল্ডঅল-এ সব জিনিসপত্র সমেত অন্য হোল্ড-অল দু'টো ঢুকিয়ে বাঁধতে বসলাম। তাহলে তিনটের জায়গায় একটা লাগেজ হয়ে যাবে। সুটকেস তিনটেকে তো আর কিছু করার উপায় নেই। সব খুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে একটা হোল্ডঅল-এ মালপত্র গুছিয়ে দেখলাম, তিনটে হোল্ড-অলকে দু'টো করা যেতে পারে। একটার মধ্যে সব কিছু ঢোকানো সম্ভব নয়। সেইভাবেই বেঁধে নিয়ে, কাঁধের ঝোলা ব্যাগগুলো গোছালাম। মাধবের ব্যাগটা যতটা সম্ভব হাল্কা করলাম। সঙ্গে নেওয়ার মধ্যে, তিনটে ওয়াটার প্রুফ, কিলোখানেক চিঁড়ে, এক প্যাকেট আমসত্ত্ব, এক প্যাকেট খেজুর, কিছু লজেন্স ও চিকলেটস, তিনটে গামছা আর সেই রামের বোতলটা। আসবার সময় তিনটে প্যাকেটে এক কিলোগ্রাম করে, তিন কিলোগ্রাম শুকনো চিঁড়ে নিয়ে এসেছিলাম। এখনও একটুও খরচ হয় নি। সুটকেসে বাকী দু'টো প্যাকেট রেখে দিলাম। সব কাজ শেষ হলে, ভালভাবে সাবান মেখে স্নান সারলাম। এই লজটায় অনেকগুলো বাথরুম পায়খানা থাকলেও, জলের বেশ অভাব। বিকেলবেলা বড় বড় ড্রামে জল ধরে রাখা হয়। দু'টো ড্রাম আছে, বোর্ডারের সংখ্যা বেশি হলে অসুবিধা হবেই। সকালে অবশ্য জল যথেষ্টই পাওয়া যায়। স্নান সেরে সেই পুরনো জামা প্যান্ট পরেই ট্রাভেলার্স লজের অফিস ঘরে গেলাম। এখানে ভালভাবে যাত্রাপথের খোঁজ খবর নিলাম। জানা গেল, গত বছরের ভয়াবহ বন্যার পর, এদিকের যাত্রাবাস ব্যবস্থা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। আরও জানা গেল যে, ডাবরানীতে বুদ্ধি সিং নামক এক ব্যক্তির কাছে ভাল থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে।

দিলীপ আর মাধব ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে এল। ডাক্তার শিব কুমার ওদের জানিয়েছেন, অন্য কেউ হলে আজ এই বিপজ্জনক, ভাঙা, অনিশ্চিত রাস্তায় যেতে তিনি বারণ করতেন। কিন্তু যেহেতু আমরা ট্যুরিষ্ট, এবং ঝুঁকি নিয়েও গঙ্গোত্রী ও গোমুখ দেখবার জন্য এতটা পথ এসেছি, তাই তিনি ওখানে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন। তবে সময়মত ওষুধগুলো যেন অবশ্যই খাওয়ানো হয়। বেশ কিছু ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ইত্যাদি তাঁর প্রেসক্রিপশন মতো ওরা কিনেও এনেছে। তবে সুখের কথা, ডাক্তার জানিয়েছেন যে, মাধবের জন্ডিস হয় নি। দিলীপ জানালো আজ তিনি কোন ফীজ নেন নি। গতকালের বাকী পাঁচ টাকা কেবল তাঁকে দেওয়া হয়েছে। দিলীপ স্নান সেরে নিল। মাধবকে খুব বেশি স্নান করতে বারণ করলাম। সাবধান থাকা ভাল।

ক্লোকরুমে তিনটে সুটকেস ও দু'টো হোল্ড-অল রেখে, তিনজনে তিনটে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ও তিনটে ওয়াটার বটল নিয়ে, লাঠি হাতে রাস্তায় এলাম। হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে, কাউন্টারে গেলাম টিকিট কাটতে। ভাটোয়ারী পর্যন্ত তিনটে টিকিটের দাম নিল ন'টাকা ত্রিশ পয়সা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার মতো রাস্তা। একটু পরে বাস ছেড়ে দিল। আমাদের পাশে এক বাঙালি ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম, একটু এগিয়ে এক বিরাট বাঁধের কাজ চলছে। গত বছর বাঁধের কাজ চলাকালীন বন্যায় গঙ্গার জল ঢুকে, সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ওখানে কনট্র্যাকটারি করেন। যাহোক, এক সময় বাস এসে ভাটোয়ারী পৌঁছলো। বাসের দু'একজন মাত্র যাত্রী ভুখি যেতে চায়। আমরা তিনজন নিজেদের গরজে বাস থেকে নেমে, বাসের অফিসে গিয়ে, ভুখি পর্যন্ত বাস নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম। প্রথমে ওরা এই প্রস্তাবে কানই দিল না। পরে আরও কিছু প্যাসেঞ্জারের অনুরোধে, ওরা জানালো কুড়ি-পঁচিশজন যাত্রী হলে, বাস ভুখি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ব্যস, আর সময় নষ্ট না করে, লেগে পড়লাম প্যাসেঞ্জারের সন্ধানে। ভুখিগামী যে কোনও লোককে দেখলেই আমরা তাকে ডেকে এনে, বাস এক্ষুণি ছাড়বে জানিয়ে বাসে বসতে বলছি। এইভাবে অনেক কষ্টে গোটা পনের লোক যোগাড় করা গেল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, ভুখি যাবার জনা কুড়ি-পঁচিশজন যাত্রী যোগাড় হল। কিন্তু বাস ছাড়ার কোন লক্ষণ কিন্তু দেখা গেল না। ফলে দু'চারজন আগ্রহী যাত্রী আবার বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। যাহোক, কর্তৃপক্ষের অশেষ কৃপা, শেষ পর্যন্ত এই রাস্তাটার জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে এক টাকা করে ভাড়া নিয়ে, বাস ছাড়ল। অল্পই রাস্তা, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস এসে ভুখি পৌঁছল।

আকাশটা আজ আবার বেশ মেঘে ঢেকে আছে, তবে এক্ষুণি বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এক যুবক আমাদের সাথে এই বাসেই এসেছে। সে নিজেই এসে আলাপ করলো। লখনৌতে বাড়ি, যাবে গরমকুণ্ডে। জিজ্ঞাসা করলাম, গরমকুণ্ডটা কোথায়? বলল, "গাংগানী" নামক জায়গাটার গঙ্গার অপর পারটার নাম গরমকুণ্ড। যুবকটি খুব সুন্দর কথাবার্তা বলে, দেখতেও বেশ সুন্দর। হাতে একটা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, কথা বলতে বলতে, একসঙ্গে হেঁটে চলেছে। আমরা কিছু কলা ও আপেল নিয়ে এসেছিলাম রাস্তায় প্রয়োজন হতে পারে ভেবে। খিদেও বেশ ভালই পেয়েছে। ভাবলাম কোথাও বসে সেগুলো খাওয়া যাবে। যুবকটি জানাল, সে গরমকুণ্ডে ওয়্যারলেসে কাজ করে। হাওড়া শিবপুরে রেমিংটন ব্যান্ডে তার বাবা কাজ করত। ফলে সে নিজেও হাওড়া কলকাতা ঘুরে এসেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, মিলিটারিতে কাজ করে কী না। বলল, ওটা মিলিটারির আন্ডারে পড়ে না। ওদের কাজ গঙ্গার জল হ্রাসবৃদ্ধির খবর, ওয়্যারলেসে উত্তরকাশীকে জানানো, এবং ওই এলাকার ওপর লক্ষ্য রাখা। তাছাড়া রাস্তা মেরামতির জন্য পাহাড় ব্লাষ্টিং করলেও উত্তরকাশীকে খবর পাঠানো, যাতে সেই সময়ে কোন যাত্রীকে আসতে দেওয়া না হয়। আরও হয়তো কিছু কাজকর্ম আছে, বিশদভাবে জানতে চাইলাম না। যুবকটি সামনে একটা দোকানে আমাদের নিয়ে চা খেতে ঢুকলো। খুব হাল্কা এক পশলা বৃষ্টি শুরু হল, সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। চা খাওয়া হলে দাম দিতে গেলে, যুবকটি বাধা দিয়ে বলল, "তাই কখনও হয়? আমাদের জায়গায় এসে আপনারা দাম দেবেন কী? আপনাদের ওখানে গেলে, তখন আপনারা দাম দেবেন"। বললাম, এটাও তো আপনার এলাকা নয়, লখনৌ গেলে আপনি দাম দেবেন। যুবকটি বলল, ওখানে গেলে আমার খরচায় সমস্ত লখনৌ শহর ঘুরে দেখাবো। বললাম, আপনাদের লখনৌ শহর আমার দেখা, খুব ভাল জায়গা। বৃষ্টি আর পড়ছে না, আমরা উঠে পড়ে দোকান থেকে রাস্তায় নামলাম।

বাস থেকে নেমে যুবকটির সঙ্গে এতক্ষণ আমরা কিন্তু বাস রাস্তা ধরেই হেঁটে আসছি। এদিকে বাস কেন আসেনা, বুঝলাম না। আরও কিছুটা পথ হাঁটার পর অবশ্য কারণটা বোঝা গেল। শুধু বোঝা গেল তাই নয়, সঙ্গে গঙ্গোত্রী যাত্রার ভবিষ্যৎ নিয়েও আমাদের মনে সংশয় দেখা দিল। রাস্তা একেবারেই নেই। কোনওকালে ছিল বলেও বোঝার উপায় নেই। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। বড় বড় শাবলের মতো লোহার রড দিয়ে ড্রিল করে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করা হচ্ছে। পরে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙে, রাস্তা তৈরি হবে। তখন লোক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা পাথরের ওপর দিয়ে অনেকটা পথ পার হয়ে যেতে হল। পাশেই গভীর খাদ। অনেক নীচ দিয়ে গঙ্গা আপন মনে বয়ে চলেছ। সেই গঙ্গা, যার উৎস দেখতেই আমাদের এত কষ্ট করে যাওয়া। খুব সাবধানে এই পথটুকু পার হয়ে এলাম। একটু পা হড়কালেই গঙ্গা মাইকী জয় হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এ জায়গাটায় রাস্তা বলে কিছু নেই। কখনো নীচুতে নেমে, কখনোবা বড় পাথর টপকে একটু ওপরে উঠে, এগিয়ে যেতে হয়। বেশ কিছুটা পথ এইভাবে পার হয়ে, আবার বাস রাস্তায় পড়লাম। গল্প করতে করতে জোর কদমে এগিয়ে চলেছি। বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে ওয়াটার প্রুফ আছে বটে, কিন্তু যুবকটি ভিজে ভিজে আমাদের যাবে, আর আমরা বর্ষাতি গায়ে দিয়ে তার সঙ্গে যাব? তাই আমরাও ভিজে ভিজেই পথ চলেছি। কোথাও যে একটু দাঁড়াব, তারও উপায় নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার থেকে, ভিজে ভিজে হাঁটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। নিজেদের জন্য যতটা না চিন্তা, তার থেকে অনেক বেশি চিন্তা মাধবকে নিয়ে। যুবকটি জানাল, আমরা প্রায় গাংগানী এসে গেছি, আর সামান্যই পথ। একটু এগিয়েই একটা ঝোলা পোর্টেবল ব্রিজ পার হয়ে, গঙ্গার

অপর পারে এলাম। পরপর দু'টো চায়ের দোকানের একটার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যুবকটি আমাদের একটা পাকা বড় ঘরে ছেড়ে দিয়ে বলল, এখানে রাতটা কাটাতে পারেন। আজ আর এগোবেন না, কারণ এখান থেকে আগেকার পাকা বাস রাস্তা আর নেই। বাস রাস্তা ছিল গঙ্গার অপর পার দিয়ে, যেদিক দিয়ে আমরা এতক্ষণ হেঁটে এলাম। এই ব্রিজের ঠিক পরেই আগেকার বাস রাস্তাটা গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেছে। সে আরো বলল, গত বছর বন্যার পর পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে, এই ব্রিজটা তৈরি করা হয়েছে। গঙ্গার এপার থেকে ডাবরানী পর্যন্ত নতুন পায়ে হাঁটার পথ বানানো হয়েছে। আর এটা একেবারেই স্থানীয় লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের উপযুক্ত হাঁটাপথ তৈরি করা হয়েছে। এখন গঙ্গোত্রী যাবার যাত্রী নেই। তাছাড়া রাতে ওই রাস্তায় ভাল্লুকের উৎপাত হয়। সামনেই একটা পাকা বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওটাই তাদের অফিস, ওই বাড়িতেই মেস করে কয়েকজনে মিলে থাকে। সে তার নিজের আস্তানার দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। যুবকটির দেখানো বড় ঘরটায় রাত্রিবাস করার সিদ্ধান্ত পাকা করে, ঘরে ঢুকে নিজেদের জামাপ্যান্ট খুলে, দরজা, জানালা ও মাটিতে মেলে শুকোতে দিলাম, যদিও বুঝতে পারছি শুকানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই, তবু যদি কিছুটা শুকনো হয় এই আশায়। এতক্ষণে কলা, আপেলগুলো যথাস্থানে ঠাঁই পেল। খিদেটাও অনেকটাই কমল। ঘরটার সামনেই একটা বড় চৌবাচ্চা মতো। তার জল বেশ গরম। চারপাশ দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়াও উঠছে। ডানপাশে, ওপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনার ধারা নেমে এসেছে। শুনলাম ঝরনাটার জল গরম আর ওই জলই এ অঞ্চলে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। আমাদের ঘরটার ভিতরে একপাশে মুখোমুখি দু'টো করে, মোট চারটে বাথরুম বা পায়খানা কিছু একটা হবে। চারটের দরজাই তালা দেওয়া। কার কাছে চাবি থাকে জানিনা, তবে ওগুলোর দেওয়াল ছাদ থেকে বেশ খানিকটা নীচে শেষ হয়েছে। বন্ধুদের বললাম, প্রয়োজনে দেওয়াল টপকে ভিতরে নেমে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু সবার আগে রাতের খাবারের একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নীচের দোকানী জানালো, চা ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। ওপরের দোকানটায় দেখলাম কয়েকজন বসে চা খাচ্ছে। একপাশে পাঁচটা খাটিয়া পাতা। কিছু পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, দোকানদার বললেন চা পাওয়া যাবে। এই দোকানের একমাত্র খাদ্যবস্তু চা আর বিড়ি। দেশলাই পর্যন্ত নেই। বললাম, রাতে এখানে থাকব, আমাদের খাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বৃদ্ধ দোকানদারকে লালাজী বলে সম্বোধন করায়, তিনি খুব খুশি হলেন। দোকানের বাইরে ডানপাশে, একটা নল থেকে ঝরনার গরম জল একভাবে পড়ে যাচ্ছে। তার পাশে কিছু ছোট ছোট শুকনো আলু পড়ে আছে, হয়তো বা রাখা হয়েছে। দেখে মনে হল পচে গেছে, তাই দোকানের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল প্রত্যেকটা আলুর গা থেকে শিকড়ের মতো কল্ বার হয়েছে। এতক্ষণে লালাজী জানালেন যে, আমরা যেখানে উঠেছি, সেটা আসলে মহিলাদের গরমকুণ্ডে স্নান সেরে কাপড় ছাড়ার জায়গা। ওখানে রাত্রে থাকতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে পুরুষদের তো নয়ই। দিলীপ আর আমি পাশাপাশি বসে। হাতে এই দোকানের একমাত্র খাদ্য - চায়ের কাপ। শোচনীয় অবস্থা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে, দারুণ শীত, চারপাশে কালো হিমালয় ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না, অনেক নীচু থেকে গঙ্গার বীভৎস আওয়াজ এক নাগাড়ে কানে বাজছে, এই অবস্থায় এখনও আমরা জানি না, রাত্রে কোথায় থাকব, কী খাব। এখানে কাছেপিঠে কোন মানুষ বাস করেনা, থাকা বা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, এখানে কোন্ মহিলা পাহাড় ভেঙে রাতে কুণ্ডে স্নান সেরে কাপড় ছাড়তে আসবে ভগবান জানেন! অপরদিকে একটা খাটিয়ায়, একজন পায়জামা-সার্ট পরা লোক বসে আছে। তার দৃষ্টিটা কীরকম যেন সন্দেহজনক। দিলীপকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য বললাম, লোকটার চাউনি মোটেই সুবিধার নয়, রাতে সতর্ক থাকতে হবে। দিলীপও আমার কথায় সায় দিল। সঙ্গে এত টাকা - মাধবের ও আমার মানি ব্যাগে বেশ কিছু টাকা আছে। তবে বেশিরভাগ টাকাই অবশ্য রাখা আছে খালি একটা বিস্কুটের প্যাকেটে। এমন জায়গায় এসে হাজির হয়েছি যে, চিৎকার করে আমাদের সতর্ক করে তারপর ঢাক ঢোল পিটিয়ে খুন করে ফেললেও, কারো জানার উপায় নেই। মাঝেমাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি লোকটা একভাবে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমরা যে ফাঁদে পড়েছি, বেশ বুঝে গেছে। লালাজী বললেন, ভাত, ডাল ও সবজি পাওয়া যাবে। আমরা বললাম, ভাত না করে চাপাটি বানানো যায় না? লালাজী বললেন, বাঙালি আদমি রুটি খাবে? বললাম, রুটিই আমরা ভালবাসি। বললেন, রুটি বানিয়ে দেবেন। একটা সমস্যা মিটল, অন্তত খালিপেটে লোকটার হাতে মরতে হবে না। বললাম রাতে তিনটে খাটিয়া চাই, সঙ্গে লেপ কম্বল। সামনের ওই ঘরে এক বন্ধু আছে, সে অসুস্থ। খাটিয়া লেপ ওখানে নিয়ে যাব। লালাজী বললেন, সব কিছুই মিলবে, তবে ওখানে রাতে থাকতে দেওয়া হয় না, কাজেই দোকানেই থাকতে হবে। আসলে ঘরটায় থাকতে চাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, দরজা আছে, এবং সেটা ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। আর এই দোকানটা একটা অতি সাধারণ চায়ের দোকান। সামনে তিনটে বাঁশের খুঁটি। সামনে ও ডানপাশটা পুরো খোলা। পিছন ও বাঁপাশটা খড়ের ও মাটির দেওয়াল মতো। খড়ের চাল। সঙ্গে এত টাকা পয়সা নিয়ে এখানে থাকা বেশ বিপজ্জনক বলেই মনে হয়। দিলীপ বলল, মাধবের সঙ্গে পরামর্শ করে, পরে এখানে আসা যাবে। রাজি হলাম না। পাঁচটাই মাত্র খাটিয়া আছে। তার মধ্যে একটা নিশ্চই লালাজীর। বাকী রইলো চারটে। তিনজন আছি। এর মধ্যে কেউ এসে হাজির হ'লে, জায়গা পাওয়া যাবে না। তখন সারারাত বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে রাস্তায় বসে কাটাতে হবে। আগে এসে খাটিয়া দখল করে, পরে অন্য চিন্তা করা যাবে।

ঘরটা থেকে দলা করে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে, দোকানে ফিরে চললাম। মাধবকে সন্দেহজনক লোকটার সম্বন্ধে সংক্ষেপে সব বললাম। দোকানে এসে তিনজনে তিনটে খাটিয়ায় সরাসরি উঠে বসে, লেপ-তোষক দিতে বললাম। পরপর তিনটে খাটিয়ায় আমরা তিনজন। আমার আর দিলীপের খাটিয়া দু'টোর মাথার দিকে, আর দু'টো খাটিয়া। স্থানাভাবে সবগুলো খাটিয়াই প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। লালাজী জানালেন, একটু পরেই লেপ তোষক বার করে দেবেন। বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে। আমরা যে যার খাটিয়ায় চুপ করে বসে আছি। সন্দেহজনক লোকটা কিন্তু এখনও বসে আছে, আর মাঝেমাঝেই আমাদের লক্ষ্য করছে। ভুখি থেকে যে যুবকটির সঙ্গে এতটা পথ হেঁটে এলাম, তার থাকার ঘরটা যদিও এক মিনিটের পথ, তবু সে আর একবারও দেখা করতে এল না। ভেবে খুব আশ্চর্য লাগল যে, যে লোকটা এতটা পথ একসঙ্গে এল, চায়ের দাম পর্যন্ত দিতে দিল না, সে আমাদের এই বিপদের সময়, একবারও দেখা করতেও এল না!

এতক্ষণে সন্দেহজনক লোকটা উঠে চলে গেল। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার খাটিয়ায় শুয়ে, গল্পগুজব করতে লাগলাম। লালাজী বলল, খাটিয়া আর লেপ তোষকের ভাড়া, মাথাপিছু চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে দিতে হবে। আজ রাতে আমরা যে জায়গায়, যে অবস্থায় এসে হাজির হয়েছি, তাতে চল্লিশ টাকা বললেও দিতে বাধ্য হতাম। আকাশ একেবারে পরিস্কার হয়ে, অসংখ্য তারা ফুটে গেছে। ঘরের খড়ের ছাদ দিয়েই নানা জায়গায় আকাশ দেখা যাচ্ছে। ভাল করে খুঁজলে হয়তো কালপুরুষ, সপ্তর্ষি মন্ডল-ও দেখা যেতে পারে। ভয় হল, রাতে জোরে বৃষ্টি এলে আমাদের কী অবস্থা হবে ভেবে। হাতে কোন কাজ নেই, সময় আর কাটে না। এক বান্ডিল বিড়ি নিয়ে, তিনজনে শেষ করতে বসলাম। কী করব, কিছু একটা তো করা চাই। লালাজী একটা থালায়, লাল, সবুজ, হলদে, কালো, নানা রঙের মেশানো ডাল নিয়ে একবার করে ফুঁ দিচ্ছেন, আর দোকান ঘরে একরাশ ধুলো উড়ে যাচ্ছে। এর থেকেও অনেক খারাপ খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমাদের হয়ে গেছে। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে যথেষ্ট। তাই খাবার তৈরির আশায় বসে রইলাম। সব শান্তির অবসান ঘটিয়ে, সেই সন্দেহজনক মক্কেল, আবার এসে হাজির হল। দিলীপ বললো ওর সাথে কথা বলে দেখলে হয়। আমরা বললাম, যেচে আলাপ করার দরকার নেই। কিন্তু দেখে মনে হল, সে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেই চায়। আমরাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম–কোথায় থাকেন, কী করেন ইত্যাদি। লোকটা এবার এগিয়ে এসে আমাদের সামনে একটা খাটিয়ায় বসল। জানতে পারলাম, এখানে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। বাড়ি মিরাটে। বছরে দু'একবার এর বেশি বাড়ি যাওয়ার সুযোগ হয় না। এখানে ওয়্যারলেস কর্মীদের সঙ্গে একই মেসে থাকে। শীতকালে এখানকার অনেকেই বাড়ি চলে যায়। তখন প্রায় একাই থাকেন। অথচ একা একা তাঁর একদম ভাল লাগে না। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, লোকটা ভাল। একা একা থেকে কথা বলার অভ্যাস কমে গেছে, সুযোগও নেই। আমাদের সঙ্গে কথা বলতেই চাইছিলেন, তবে নিজে থেকে আগে কথা বলা ঠিক হবে কী না ভেবে, এতক্ষণ বলেনি। ওর কাছ থেকে গত বছরের বন্যার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম।

গত বছর পাঁচই আগষ্ট রাত্রিবেলা, এই গাংগানীর কিছুটা আগে ডাবরানীর দিকে পাহাড়ের একটা চূড়া গঙ্গার ওপর ভেঙে পড়ে। ওখানে গঙ্গা খুব সরু, ফলে জল চলাচল একবারে বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন সকালে সবাই দেখে গাংগানীতে গঙ্গা একবারে শুকিয়ে গেছে। দু'একটা ঝরনার জল, ও গঙ্গার যেটুকু জল চুঁইয়ে আসতে পারে, সেই জলই সামান্য ধারায় বয়ে যাচ্ছে। ছয় তারিখে প্রায় বিকেল নাগাদ, গঙ্গার জমে থাকা বিপুল জলের চাপে, ওই ভেঙে পড়া পাথরের একটা অংশ ঠেলে আরো ভেঙে ফেলে, প্রবল বেগে জল নীচের দিকে, অর্থাৎ গাংগানী, ভুখি, বা উত্তরকাশীর দিকে ধেয়ে আসে। বর্ষাকালের প্রায় বার-চোদ্দ ঘন্টার জমে থাকা জলের স্রোত, হঠাৎ মুক্ত হয়ে ভীষণ আকার ধারণ করে সমস্ত শহর ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিয়ে বয়ে চলে যায়। এই গাংগানীতে, যেখানে আমরা এখন বসে আছি, তার অপর পারে দু'টো গেষ্ট হাউস, একটা আয়ুর্বেদিক কলেজ, একটা ইন্টার হাইস্কুল, কালীকম্বলীর ধর্মশালা ও বেশ কয়েকটা হোটেল ছিল। এক কথায় ওটা একটা বেশ বড় পাহাড়ি শহর ছিল। এখন এই মুহূর্তে আমরা যে জায়গাটায় আছি, তার নাম গরমকুণ্ড। গঙ্গার অপর পারটার নাম গাংগানী। এ দিকটায় খাড়া পাহাড়, অপর দিকে প্রায় গঙ্গার লেভেলেই ছিল গাংগানী শহর, বাস রাস্তা। ফলে গঙ্গার জল ওই বিশাল পাথর ঠেলে যেতে না পেরে, ডানদিকে বেঁকে গাংগানীর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে, সমস্ত শহরটাকে ভেঙে নিয়ে যায়। আসবার সময় এত ঘটনা আমরা জানতাম না। তবে আমাদের বাড়ির কাছে যে ভদ্রলোক গঙ্গোত্রী যেতে না পেরে ফিরে এসেছিলেন, তাঁর কাছে এরই খবর শুনে, ইউ.পি. ট্যুরিজম অফিসে জিজ্ঞাসা করে আমরা হাসির খোরাক হয়েছিলাম তাতো বলেইছি। দোষটা তাদের নয়, তারা এ খবর জানতো না বা জানবার চেষ্টাও করে নি। আসবার

সময় দেখেছিলাম, একটা ছোট মন্দির ও একটা ভাঙা বাড়ির দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই ওদিকে নেই। ভদ্রলোক জানালেন, পাঁচজন ট্যুরিষ্ট মারা যায়, তারা সবাই ছিল বাঙালি। স্থানীয় লোকেরা বিপদের আশঙ্কা করে আগেই বাড়িঘর, জিনিসপত্র ফেলে, ওপর দিকে পালিয়ে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে রক্ষা পায়। যাহোক, ভদ্রলোক এবার মেসে ফেরার জন্য উঠলেন। আমরা ডাবরানী আর কতটা রাস্তা, রাস্তায় দোকান পাব কী না, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করায়, ভদ্রলোক জানালেন ভুখি থেকে গাংগানী পাঁচ কিলোমিটার পথ। আবার এখান থেকে ডাবরানী আট কিলোমিটার পথ। পথে কোনও দোকান পাওয়া যাবে না। রাস্তাও খুবই কষ্টকর। এবার ভদ্রলোক বাসায় ফিরে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, কোন ভয় নেই। আপনারা ঠিক ভালভাবে পৌঁছে যাবেন, আমার শুভেচ্ছা রইল। ফিরবার পথে অবশ্যই দেখা হবে।

এদিকে লালাজীর রান্নাও শেষ। পাশের কাপড় ছাড়ার ঘরটা থেকে, চেঁচামেচির আওয়াজ আসছে। শুনলাম একদল পুরুষ ও মহিলা ওখানে এসে উঠেছে। আগেভাগে এখানে এসে জায়গা নিয়েছি বলে, নিজেদেরকে এখন ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। আমরা খাবার খেতে উঠতেই, লালাজী বললেন, ওখানে বসেই প্রেমসে খানা খাও। ডাল, সেই ছোট ছোট আলুর তরকারি, যার অধিকাংশই শক্ত এবং পচা, আর শোনপ্রয়াগের দোকানের পদ্ধতিতে তৈরী একপিঠ পোড়া অপর পিঠ কাঁচা সেই উপাদেয় রুটি। আলুর তরকারিতে একটু করে মাখন দিয়ে নিয়ে, মৌজ করে খাওয়া শুরু করলাম। এরকম একটা জায়গায় এই পরিবেশে বিনা পরিশ্রমে খাটিয়ায় বসে এই খাবার পেয়েই, লালাজীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আর সত্যি কথা বলতে, কী ভালই যে লাগল, মনে হল অমৃত খাচ্ছি। জানিনা একেই "খিদে পেলে বাঘে ধান খায়" বলে কী না। অসুস্থ মাধব পর্যন্ত তিনটে রুটি মেরে দিল। এখানকার মতো বড় বড় রুটি না হলেও, আমি বোধহয় খান ছয়-সাত উদরস্থ করে ফেললাম। তারপর দোকানের বাইরে একটু দাঁড়িয়ে, আকাশে অসংখ্য তারার মেলা ও নীচে গঙ্গার গর্জন উপভোগ করে, খাটিয়ায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। এর কাছে দিল্লির লালকেল্লার "লাইট অ্যান্ড সাউন্ড" তুচ্ছ মনে হল। আকাশে একসঙ্গে এত তারা আগে কখনও কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। চারপাশে যে কী অন্ধকার বলে বোঝানো যাবে না। মনে হচ্ছে দরজা জানালাহীন একটা ঘরে, অমাবস্যার রাতে, আলো না জ্বেলে, আমরা শুয়ে আছি। মাধবের মানিব্যাগ, আমার মানিব্যাগ ও বিস্কুটের প্যাকেটটা আমার পিঠের তলায়, তোষকের ওপর রেখে, লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। উঁচু হয়ে থাকায় শুতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। লেপ-তোষকের সাদা রঙ বোধহয় বাইরের অন্ধকারের কালো রঙকেও হার মানাবে। তেমনি তার সুগন্ধ। ঘুম আসছে না। একটু পরেই নতুন বিপদ এসে হাজির হল। অসংখ্য ছাড়পোকার মতো এক রকম পোকা, সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিল। লালাজী আশ্বাস দিয়ে জানালেন, ও কিছু না, পিসু আছে। তাঁর বলার ধরণ দেখে মনে হল বাস্তু সাপের মতো এগুলো বাস্তু পিসু। পিসুকে একপ্রকার রক্তচোষা উকুন বলা যায়। হাওড়া-কলকাতায় এ জাতীয় এক প্রকার ছোট্ট, অতি পাতলা পোকাকে চামউকুন বলতে শুনেছি। লোমকূপে আটকে থেকে রক্ত চুষে খায়। নখ দিয়ে খুঁটেও তাদের লোমকূপ থেকে তুলে ফেলা যায় না। লালাজীর মুখে পিসুর কথা শুনে মনে হচ্ছে পাহাড়ি চামউকুনের খপ্পরে পড়েছি। রাতদুপুরে খাটিয়ায় উঠে বসে খস্ খস্ করে সারা শরীর চুলকাতে শুরু করলাম। এর আবার আর একটা অন্য যন্ত্রণাও আছে। গলা, কান, মুখ বা দেহের অন্য কোন অংশের চামড়ার ওপর দিয়ে এরা হেঁটে যাবার সময় একটা অস্বস্তি হয়। হাতের তেলো দিয়ে ঘষে ফেলে দেবার চেষ্টা করলে, এরা হাঁটা বন্ধ করে দেয়। মনে হবে শরীর থেকে পড়ে গেছে বা মরে গেছে। কিন্তু একটু পরেই আবার সেই পুরানো জায়গা থেকেই শরীর ভ্রমণ শুরু করে। মাধব ও দিলীপ ঘুমিয়ে পড়েছে। হতভাগ্য আমি একা জেগে বসে গা, হাত, পা চুলকে যাচ্ছি। এইভাবে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, হঠাৎ মনে হল মাথাটা কে যেন কিছু দিয়ে খুব জোরে ঘষে দিল। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, মাথার কাছের খাটিয়াটায় কখন একজন এসে রাতের আশ্রয় নিয়েছে। ঘুম মাথায় উঠল। নতুন করে আবার গা চুলকাবার পালা শুরু হল। লোকটাকে মনে মনে অভিশাপ দিয়ে ফের ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। ঘরের ছাদের ফাঁক দিয়ে একটা জ্বলজ্বলে তারাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ওটা শুকতারা না মঙ্গল গ্রহ ভাবতে বসলাম। মাধব আর দিলীপ ঐ নোংরা লেপই মাথা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। আমার পেটটা আবার কেমন ব্যথা-ব্যথা করতে শুরু করল। একবার বাইরে যেতে পারলে হ'ত। আসবার সময় জায়গাটা ভালভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি। টর্চ সঙ্গে থাকলেও, অন্ধকারে একা একা কোথায় যাব ভেবে পেলাম না। একবার ভাবলাম মাধবকে ডাকি, তারপর ওকে আর বিরক্ত না করে চুপচাপ শুয়ে থাকলাম।

আঠাশে আগষ্ট। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, এক কাপ চা পর্যন্ত না খেয়ে, লালাজীকে থাকা-খাওয়া বাবদ তেইশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মিটিয়ে দিয়ে, ব্যাগ নিয়ে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বঁ হাতে রাস্তা। একটু ওপরে উঠে রাস্তায় পড়লাম। তিনজনে লাইন দিয়ে এক কাঁধে ব্যাগ, এক কাঁধে ওয়াটার বটল নিয়ে, লাঠি হাতে আস্তে আস্তে হেঁটে চললাম। সামান্য কিছু রাস্তা হাঁটার পরই, ডানপাশে একটা ঝরনা পাওয়া গেল। মাধব ও দিলীপকে বললাম, রাস্তায় আর ঝরনা পাওয়া যাবে কী না জানি না। কাজেই এখানেই সকালের কাজটা সেরে ফেলার ব্যবস্থা করা যাক। কিন্তু শেষ অবধি মস্ত বড় একটা ভুল করলাম, ওয়াটার বটলগুলোয় জল না ভরে নিয়ে। তারপর অনেকটা রাস্তা পার হয়ে এসেও, সত্যিই আর কোন ঝরনার দেখা পেলাম না। একে এরকম রাস্তার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। বোধহয় ৬৫-৭০ ডিগ্রি কোণে রাস্তা সোজা ওপর দিকে উঠেছে। মাঝে মাঝে স্থানীয় লোকেরা বেশ দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে। আমাদের কিন্তু এর মধ্যেই দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম। এখনও পর্যন্ত এত কষ্টকর রাস্তায় কখনও হাঁটতে হয় নি। স্থানীয় লোকেদের কাছে শুনেছিলাম, গাংগানী পর্যন্ত বাস রাস্তা হয়তো সামনের বছরেই তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু গাংগানী থেকে ডাবরানী বা ডাবরানী থেকে লঙ্কা পর্যন্ত রাস্তা কবে হবে, বলা খুব মুশকিল। ভুখি থেকে হেঁটে আসার সময় দেখলাম গাংগানী পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজও হচ্ছে। নদীর ওপার দিয়েই রাস্তা ছিল। কিন্তু এখন আর ওপারের পুরনো রাস্তা মেরামত করা সম্ভব নয়। নতুন করে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করা সম্ভব কী না জানিনা। নদীর এপার দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি করলেও, যে রাস্তা দিয়ে আমরা এখন হাঁটছি, সেটা কোনও কাজে আসবে বলে মনে হয় না। একে এটা একবারে কাঁচা পাহাড়, তার ওপর এ যা রাস্তা, জীপও উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। যাহোক, এক সময় আমাদের ওপরে ওঠার পালা শেষ হল। এবার ঠিক আগের মতই ৬০-৬৫ ডিগ্রি কোণে রাস্তা নীচে নামতে শুরু করল। রাস্তার পাশ দিয়ে ওয়্যারলেস বা টেলিগ্রাফের তার গেছে। নীচে, অনেক নীচে ভয়ঙ্কর-রূপিনী রূপালী গঙ্গা, আপন খেয়ালে নেচে নেচে বয়ে চলেছে। পায়ের আঙুলের ওপর চাপ দিয়ে ব্রেক কষার মতো করে নীচে নামার গতি রোধ করে করে, এগিয়ে চললাম। নীচে নামার সময় আমার কোন কষ্ট হয় না, তাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মাধবের আবার ঠিক উল্টো। ওপরে ওঠার সময় ওর বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এবার এই ভাবে নীচে নামতে, ওর বেশ কষ্ট হচ্ছে। একভাবে নীচে নামতে নামতে, আমরা একবারে নীচে, প্রায় গঙ্গার কাছাকাছি নেমে এসে দেখলাম, রাস্তা আবার ওই আগের মতো একই ভাবে, ওপরে উঠতে শুরু করল। কোথাও কোন গ্রাম, দোকান, এমন কী লোকজনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে পাশ দিয়ে মালবোঝাই দু'একটা খচ্চর যাতয়াত করছে। হাঁটতে যে কী কষ্ট হচ্ছে বোঝাতে পারব না। রাস্তার ধারে বিশ্রাম নিতে বসলাম।

মাধবের খুব জল তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে ঝরনার অনেক খোঁজ করলাম, কিন্তু কোথাও কোন ঝরনা বা জলের সন্ধান করতে পারলাম না। গঙ্গার জল ঘোলাটে, তবু সে জলও যে একটু নিয়ে আসব, তারও উপায় নেই। ওখানে নামা আমাদের কর্ম নয়। সে চেষ্টা সুইসাইডের নামান্তর। রাস্তার একপাশে পাথরে বসে তিনজনে আমসত্ত্ব চুষে, লজেন্স খেয়ে, জল পিপাসা কমাতে ও বিশ্রাম নিতে লাগলাম। কিন্তু এর পরেও মাধব বলল, একটু জল না পেলে, ওর পক্ষে আর এক পাও হাঁটা সম্ভব নয়। বললাম, এখানে বসে থাকলেও তো জল পিপাসা কমবে না। কাজেই বাঁচতে গেলে কষ্ট হলেও এগিয়ে যেতে হবে। রাস্তায় জল পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা মোটেই নেই। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। মধ্যে মধ্যে জলের আওয়াজ কানে আসছে বলে মনে হচ্ছে। খুব আশা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারছি ভুল শুনেছিলাম। কী রাস্তারে বাবা, আট কিলোমিটার পথে একটাও ঝরনা বা কোনো জলের দেখা নেই! আমরা যেন এক হিমালয়ান ডেজার্টের ওপর দিয়ে হাঁটছি। মরীচিকা তো দেখার ভুল বলেই জানতাম, শোনার ভুলের মরীচিকাও হয় বলে তো কখনো শুনিনি। এক জায়গায় গঙ্গা দেখলাম বেশ চওড়া, এবং আমাদের হাওড়া-কলকাতার গঙ্গার থেকেও স্রোতহীন। রাস্তার পাশে কোথাও কোথাও, বড় বড় পাথরের গায়ে সাদা রঙ করে, আলকাতরা দিয়ে কত রাস্তা বাকী আছে লেখা আছে। এগুলোই এপথের মাইলস্টোন। এবার রাস্তার পাশে একটা ঝরনার দেখা মিলল। মনে হচ্ছে আমরা প্রায় এসে গেছি। আর ভালোও লাগছে না। এতবড় রাস্তার শুরুতে আর শেষে দু'টো ঝরনা, আর এই কষ্টকর রাস্তা। তবু ভুললে চলবে কেন -"সব ভাল যার শেষ ভাল"। মাধব তো ঝরনা দেখে প্রায় লাফিয়েই উঠল। পারলে ছুটে গিয়ে সব জল খেয়ে নেয়। ওকে ঝরনার জল খুব বেশি না খেয়ে, শুধু গলা ভেজাতে বললাম। যদিও বাড়ি থেকে আসার সময় ভেবে এসেছিলাম, কোথাও ঝরনার জল খাব না। প্রয়োজনে খেতে হলে জিওলিন মিশিয়ে খাব। কিন্তু বাস্তবে একটু পরিস্কারভাবে জল তোলা যায় এমন জল দেখলেই আমরা দু'হাত ভরে নিয়ে পান করেছি। জিওলিনের কথা মনেও আসে নি। মাধবের শরীরটাও তো ভাল নয়, ওষুধ খেয়ে পথ চলছে। আমরাও অল্প অল্প জল খেলাম। জল ভর্তি কাঠি, খড়কুটো। তবু এবার কষ্টের পরিমাণ অনেকটাই লাঘব হল।

একটু এগিয়ে একটা ব্রিজ দেখলাম গঙ্গার মাঝখানে কাত হয়ে পড়ে আছে। সম্ভবত বন্যার সময় ওটা জলের তোড়ে ভেঙে পড়েছিল। গঙ্গা এখানে এত চওড়া হয়ে গেছে যে, যে ব্রিজ আগে গঙ্গার ওপর এপার-ওপার করার জন্য ব্যবহৃত হ'ত, সেই ব্রিজ এখন নদীর মাঝখানে পড়ে আছে। ব্রিজের দু'দিকেই অনেকটা দূরে ডাঙা। যাহোক, রাস্তা এবার ভীষণভাবে নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। লাঠির ওপর ভর দিয়ে হাঁটলে কষ্ট অনেক কম হচ্ছে। পাথর ফেলা রাস্তা। এদিকে বোধহয় মাটিতে অভ্র মিশে থাকতে পারে। মনে হচ্ছে রাস্তা যেন অভ্রের পাত দিয়ে মোড়া। বড় বড় গাছের জন্য এতটা রাস্তার কোথাও একটু সূর্যের আলো পড়ে না। ফলে স্যাঁতস্যাঁতে, ভিজে ও বিপজ্জনকও। মাইলস্টোন অনুযায়ী, আর সামান্যই পথ বাকী আছে। অবশ্য যদি না

এখানেও ত্রিযুগীনারায়ণের মতো রাস্তার মাপ হিসাব করা হয়ে থাকে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও কিন্তু পাকা রাস্তা, বাস, দোকানপাট বা লোকজন চোখে পড়ছে না। এতটা পথ এলাম, একেবারে শুরুতে লালাজীর দোকানের একটু ওপরে সামান্য রাস্তা হেঁটে একটা চায়ের দোকান ছাড়া, সত্যিই আর কোনও দোকান নেই। এবার সামনে একটা ব্রীজ চোখে পড়ল। গাংগানী থেকে গরমকুণ্ড আসার জন্য যেমন পোর্টেবল ব্রিজ পার হতে হয়েছিল, সেরকমই একটা ব্রিজ। এই ব্রিজ পার হয়ে আবার গঙ্গার ওপারে, বাস রাস্তায় এসে উঠলাম। গাংগানী থেকে ডাবরানী, এই আট কিলোমিটার পথ, গঙ্গার ওপার দিয়ে হাঁটতে হয়। অর্থাৎ এই দু'টো জায়গার মধ্যে পুরনো বাসরাস্তার অবস্থা গত বছরের ঘটনায় এমন হয়েছে যে, বাস তো দূরের কথা, হেঁটেও যাওয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়ে এই নতুন রাস্তা দিয়েই হেঁটে আসতে হয়। আর সত্যিই এটা একেবারেই স্থানীয় লোকেদের হাঁটার পথই বটে। ব্রিজটা পার হয়ে, রাস্তা ধরে একটু এগিয়েই দেখলাম একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। লঙ্কা যাবে কী না জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম, আরও এগিয়ে গেলে বাস পাওয়া যাবে। কথাটা শুনে মনে হল আমরা লঙ্কা প্রায় পৌঁছেই গেছি।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

আগের পর্ব - এবার কাহিনি কেদারনাথের

গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগর

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোনও পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এখন নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বাদল দিনে

তপন পাল

বর্ষা এলে কী হয়?

বর্ষা এলে অনেক কিছুই হয়। মাঠে আমন চাষ শুরু হয়। ব্যাঙ আর কবিদের আনন্দ হয়, গঙ্গায় ইলিশ মাছের আগমন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এর সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারও হয়। ভ্রমণপিয়াসী স্বল্পসাধ্যের মানুষ, যাদের গরম এড়াতে খারদুংলা-নুব্রা নিদেনপক্ষে দেরাদুন-মুসৌরি যাওয়ার মত সময় বা সাধ্য নেই, তারা পুরো গরমকালটা ঘরে বসে থাকে, দেওয়ালে পাহাড় বা জঙ্গলের ওয়াল পেপার সাঁটে। তারপর বৃষ্টি নামলে...

আমার পাহাড়ে গেলে ভয় করে, জঙ্গলে গেলে বিরক্ত লাগে। আর পাহাড় বা জঙ্গল কোনটাই তো আর কোলকাতার ধারে কাছে নেই। সে যাওয়ার হ্যাপাও অনেক। রেলগাড়ির টিকিট কাটো চার মাস আগে, থাকার জায়গা নিশ্চিত করো দু মাস আগে..... তারপর যাওয়ার দিন এলে হয়তো দেখলে যে এতদিনে অফিস তোমার গুরুত্ব বুঝেছে। বুঝেছে যে অফিস চলছে তুমি আছো বলেই, তুমি থাকা সত্ত্বেও নয়। তাই ছুটি হবে না। তখন এদিকও গেল, ও কূলও।

তবে আমি যে পাহাড় জঙ্গল দেখি না তা নয়। পাহাড় জঙ্গল দেখার ইচ্ছা হলেই চলে যাই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা ব্যস্ত জংশন স্টেশন – দমদম জংশনে। সেখান থেকে চক্ররেলের একটি রেলগাড়ি ধরে কোলকাতা, প্রিন্সেপ ঘাট হয়ে মাঝেরহাট। দমদম জংশন থেকে গাড়ি ছাড়লেই মাটির অতিকায় ঢিবি, বনস্পতিকুল .... আমার পাহাড় জঙ্গল দর্শন হয়ে যায়। গরিবের রাংতাই সোনা... তাই না!

পাহাড় ও জঙ্গল, যুগপৎ দুই-ই স্বল্পব্যয়ে দেখে ওঠার একটা ভালো পন্থা হাওড়া থেকে দশটায় ঘাটশিলা মেমু ধরা। পৌনে দুটোয় ঘাটশিলা, পনের মিনিট বিরতি দিয়ে এই রেলগাড়িতেই প্রত্যাবর্তন, হাওড়া ছটা বাইশে। কানা দামোদর, দামোদর, রূপনারায়ণ পেরিয়ে খড়গপুর। তারপর অজস্র রেললাইন। নিমপুরা ইয়ার্ড – কোনও রেললাইন নীচে নেমে যায় তো কেউ উঠে যায় ওপরে। কেলেঘাই কংসাবতী পেরিয়ে ঝাড়গ্রাম। তারপর থেকে ভূচিত্র বদলায়। মাটির রং বদলে লাল। কাজলা গাং, দুলুং নদী পেরিয়ে গিধনি, তারপর কানি মোহুলি। স্টেশনটি নামটির মতনই সুন্দর; নীচু প্ল্যাটফর্ম বিলীন হয়ে গেছে দিগন্তে - জঙ্গল টাঁড় পেরিয়ে। অনেকখানি দূরে দূরে ছবির মত এক একটি স্টেশন। চাকুলিয়া স্টেশনটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২৬ মিটার ওপরে - নিজেকে যেন পর্বতারোহী মনে হতে থাকে, মনে হয় বাতাসে অক্সিজেন লঘু হয়ে এসেছে। কোকপাড়া আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ধলভূমগড় পেরিয়েই ঘাটশিলা। ফেরা ওই পথে।

আমার ভালো লাগে জল। নদী নালা, খাল বিল সাগর দিঘি। জল দেখতে হলে বর্ষার চেয়ে ভালো সময় কখন আছে? কর্মসূত্রে আমাকে দামোদর ও রূপনারায়ণের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে হয়। সেই সূত্রে গড়চুমুক বা বোয়ালিয়া, গাদিয়াড়া বা মহিষরেখা, ধান্যখোরি বা কোলাঘাট জলভাত। এবার যেতে হবে খোদ গঙ্গায়, মানে হুগলিতে আর কী।

২

রবিবার সকালে এক প্রস্থ বৃষ্টি, দুপুরে আবার এক প্রস্থের তোড়জোড় হতেই ফোন পাড়ার এক অটোচালককে। কি গো রিজার্ভে যাবে নাকি? শ্রীমানকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। প্রায়ই তিনি আমার মাতাঠাকুরানিকে ও স্ত্রীকে মন্দির, ডাক্তারখানা ইত্যাদি অতিশয় দায়িত্ব সহকারে ঘুরিয়ে আনেন। দরদস্তুর করারও কিছু নেই। আমি জানি শ্রীমান বেশি চাইবেন না – শ্রীমানও জানেন কাকা কম দেবে না।

দশ মিনিটের মধ্যে দ্বারে উপনীত স্বতশ্চলশকট। যাত্রী আমি একা। বেড়াতে যেতে একাই ভাল। কারণ সেখানে আমাকে অন্যের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় না। আমার হয়তো ইচ্ছে হল সৈকতে বসে বৃষ্টি দেখব। কিন্তু সঙ্গীটির যদি ঠাণ্ডার ধাত থাকে, সে বলবে হোটেলের বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে। বেড়াতে এসেও অন্যের কথা শুনে চলতে হলে বেড়াতে যাওয়ার দরকার কী – অফিসে বসে থাকলেই হয়!

এছাড়াও একটা গূঢ় কারণ আছে, পাঁচকান না করাই ভালো। তবে তোমরা তো আমার নিজের লোক, তোমাদের বলতে অসুবিধা নেই। ছুটির দিনে আমি কাছাকাছি যাই, বর্ধমান অথবা দীঘা, বোলপুর অথবা ঝাড়গ্রাম, বা শুধু রেলগাড়ি চাপার ইচ্ছে হলে বরাবিল বা বালাসোর, রাঁচি অথবা রামপুরহাট, ঘাটশিলা বা কাটোয়া। এমত ভ্রমণে আগে সঙ্গী থাকত। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সঙ্গী বদলে যায়, গন্তব্য বদলে যায়, কিন্তু যেটা বদলায় না সেটা হলো সঙ্গীর স্বভাব – সাতসকালে, হাওড়া পৌঁছেই তার হা হতোস্মি আক্ষেপ, এই যা, ব্যাগ বদলেছি তো, কার্ড ফার্ড সব ফেলে এসেছি বাপ্পাদা...।

অটোয় বজবজ, চড়িয়াল। বাঁয়ে, বিড়লা মোড়; ডাইনে ক্যালসিয়াম মোড়। ফের বাঁয়ে, ডোঙ্গরিয়া। ফের ডাইনে, দক্ষিণে চব্বিশ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ পশ্চাদভূমি পেরিয়ে এসে পড়া গেল রায়পুর। বেপাড়ার অটো তাদের এলাকায় ঢুকেছে ভেবে স্থানীয় অটোভ্রাতারা রে রে করে তেড়ে এসেছিলেন। তারপর যখন দেখলেন যে এটি তথাকথিত রিজার্ভ এবং নেহাতই এক বুড়োহাবড়া জল দেখতে এসেছে, তখন বিস্তর ক্ষমা-টমা চেয়ে চা খাইয়ে দিলেন। তারপর আমার অটো চালককে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী সব বললেন।

"ওরা তোমাকে কী বললো গো"? জবাবে যা শোনা গেল তা নিদারুণ। এই রাস্তায় একটি জনপ্রিয় সুইসাইড পয়েন্ট আছে। সেখনে সড়ক সমীপবর্তী নদী অতিশয় গভীর এবং জল ঘূর্ণায়মান। আত্মহত্যাকারীদের শুধু পা পিছলে দেওয়ার অপেক্ষা। নদী কপ্ করে গিলে খাবে তোমাকে। তারপর দেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ তো আর কোলকাতা শহরের সভ্য বাবুলোক নয় যে জলে দেহ ভাসতে দেখলে পুলিশে খবর দেবে, এরা বরং পাড়ে দেহ লেগে আছে দেখলে বাঁশ দিয়ে মাঝগঙ্গায় ঠেলে দেবে, ভাঁটায় তুমি সুন্দরবনে।

শুভাকাঙ্খীরা আমার অটোওলাকে বলেছেন কাকাকে কোন অবস্থাতেই গাড়ি থেকে নামতে দিও না; আর আমাকে সাপের ভয় দেখিয়ে সতর্ক করেছেন। "কাকা গাড়ি থেকে নামবেন না, যতই পায়ে বুট জুতো থাক।"

আমার শৈশবে এখনকার শহর-শহরতলি ছিল আদ্যন্ত গ্রাম। সেইভাবে বেড়ে ওঠার সুবাদে সাপ নিয়ে আমার সতর্কতা আছে, আগ্রহও আছে, কিন্তু আতঙ্ক নেই। আমি সাপ চিনি, কারণ জীববৈচিত্র্য আমাকে বই পড়ে জানতে হয়নি – জীবনই শিখিয়েছে। আর সেই জন্যেই জানি সাপ নিয়ে মানুষের যত ভুল ধারণা তত আর অন্য কোন প্রাণী সম্বন্ধে নেই। ওল্ড টেস্টামেন্টের নন্দন কানন থেকে মহাভারতে আস্তিকের সর্পযজ্ঞ - সাপ সবার কাছেই শত্রু- তাকে দেখলেই মারতে যেতে হয় - যদিও দেশের আইনে যে কোন প্রজাতির সাপ মারাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তবু দুশ্চিন্তা যায় না। অটোভ্রাতারা আমাকে আত্মহত্যাপ্রবণ মনে করলেন কেন? আমার চেহারায় কি তবে বিষাদের গাঢ় ছাপ লেগে আছে সর্বত্র! বাজারের মধ্যে দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পরেই নদী যেন ঝাপটা দিয়ে তোমার বুকের ভেতরে - এই ভরা বর্ষায় তার রূপই অন্য।

৩

রায়পুর থেকে বুড়ুল, এই সাড়ে সাত কিলোমিটার সুসংস্কৃত রাস্তা নদীর একদম গা বেয়ে - জোয়ারের জল উঠে আসা সান্নিধ্যে। এই রাস্তার দুপাশে অনেক বাগানবাড়ি, শীতের সপ্তাহান্তে এবং চলতি দিনেও বনভোজন সাথীদের ভাড়া দেওয়া হয়। এছাড়া রাস্তার ধারের খোলা জমিতেও অনেকে বনভোজন করেন। এবং প্রায়শই সেই জমির দখল নিয়ে বনভোজন সাথীদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে যায়। বিগত শীতে আমি ও শ্রীমতী পাল এরকম একটি বনভোজন থেকে ফেরার সময় ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। দুটি অপ্রকৃতিস্থ বনভোজনকারী যূথের হাতাহাতি শেষ পর্যন্ত ছুরি মারামারির স্তরে পৌঁছায় এবং আরক্ষাবাহিনী এসে পড়েন।

বারবার যাতায়াতের সূত্রে একটি বাগানবাড়ি কিঞ্চিৎ পরিচিত। শীতকালে অনেকবার পিকনিক করে গেছি। এখন সব শুনশান। তবু একবার দরজায় ধাক্কা দিই। তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তিটি দরজা খুলে দেন। "কি গো একটু বসা যাবে"। "তা তো যাবে কিন্তু দাদা বসবেন কোথায়"। সত্যিই তো। শীতে নদীর একদম ধারে যে মাটির বাঁধের ওপর বসি তা এখন জলের তলায়। অগত্যা ঘরের বারান্দায়। মরশুমি ফুলের ঋতু শেষ, বৃষ্টির জল পেয়ে চারিদিকে লকলক করে বেড়ে উঠেছে আগাছা। বারান্দায় বসি, চা আসে, দেখতে পাই অনর্গল নৌকার সারি, কেউ পালতোলা, কেউ ডিঙি। রঙিন পাল তুলে ভরা নদীর বুকে বড় বড় নৌকা - জোরে বাতাস দিচ্ছে। আকাশে মেঘ।

এখন রাস্তা শুনশান, কেউ কোথাও নেই। বাগানবাড়িগুলির প্রাঙ্গণে জল আর রাস্তার ধারের খোলা যে জমিগুলিতে বনভোজন হয় জলের তলায়। গুল্মলতাদি নববর্ষা সিঞ্চনে এতখানিই আকুলিত যে বেড়ে এসে রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে। বোঝা গেল সাপের ভয় খুব একটা অমূলক নয়। একটি অতি নিরীহ প্রজাতির ফুট পাঁচেকের দাঁড়াশ (Rat Snake : Ptyas mucosa) বেচারা রাস্তা পেরতে গিয়ে অটো দেখে এমন ভয় পেল যে আমারই লজ্জা করছিল। বোঝাই গেল যে গর্তে জল ঢুকে পড়ায় সে বিপন্ন। আর দেখা হলো এক ঘরচিতি (Common wolf Snake: Lycodon avlicus) দম্পতির সঙ্গে। একেবারেই নিশাচর এই প্রজাতির যুগলটি কোন আনন্দে বা সাহসে যে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির মাঝে ডিগবাজি খেতে এলেন, বোঝা গেল না। পায়ে বর্ষার উঁচু জুতো, জিনসের প্যান্ট। বিপদের আশঙ্কা একেবারেই নেই। তাই নেমে একটু ভালো করে দেখা গেল। নির্বিষ, নিরীহ এই সাপটি নিয়ে বাঙালির ভুল ধারণার শেষ নেই। ইনি নাকি গৃহস্থের বিছানায় ঢুকে বসে থাকেন। নিদ্রিত ব্যক্তির মস্তকে নৈশকালে দংশন করেন, তাগা বাঁধা যায় না, ডাক্তার বদ্যি ওঝা কবরেজ, হাসপাতাল করার সময় থাকে না। ভোর হবার আগেই মৃত্যু। এর প্রধান কারণ প্রজাতিটি ভীষণ দর্শন। এদের মাথা চওড়া, ঘাড়ের চেয়ে বড়। তাই এর ইংরাজী নাম Wolt Snake, তদুপরি অনেকেই একে তীব্র বিষধর কালাচ (Common Krait : Bungarus cearuleus) -এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। দুজনেই নিশাচর, দুজনেরই ঘাড়ের চেয়ে মাথা বড়; কিন্তু কালাচ যেখানে চকচকে কালোর উপর সরু সাদাটে হলুদ দাগ, ঘরচিতি সেখানে চকচকে বাদামির ওপর চওড়া হলুদ দাগ। ঘরচিতির আর একটি গুণ এরা অতি ভিতু ও প্রায়শ মস্ত ভীতিপ্রদ হাঁ করে কামড়াতে আসে। তবে গোলানোটাই স্বাভাবিক। সূর্যাস্তের পর জ্যান্ত, মরা অথবা রবারের, যে কোন সাপ দেখলেই লোক আঁতকে ওঠে। আর অল্প আলোয় বা প্রায়ান্ধকারে, কালো আর গাঢ় বাদামি রঙের তফাৎ চোখে না পড়াই স্বাভাবিক।

তবে ঘরচিতি বলেই নামলাম। কালাচ, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যার আদরের নাম শিয়রচাঁদা, হলে কি আর নামতাম, যতই জুতো থাক আর প্যান্ট থাক। তথ্যের খাতিরে জানাই কালাচের এক মিলিগ্রাম বিষ পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের মৃত্যু ঘটাতে যথেষ্ট এবং এক একটি কামড়ে কালাচ ২০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ ঢালতে পারে। দংশিত ব্যক্তি অনেকক্ষেত্রেই বুঝতেই পারেন না তাঁকে কিছুতে কামড়াল এবং ঘুমের মধ্যেই মারা যান। তবে

মা কালীর দিব্যি, সর্পদম্পতিটিকে আমি বিন্দুমাত্র বিব্রত করিনি। সম্ভবত আমার উপস্থিতি এঁরা টেরও পাননি। নদীতীরে ক্রীড়ারত নিরীহ সর্পদম্পতির বিরক্তির উদ্রেক করে সর্পমুখে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীসমা/ যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধি কামমোহিতম' জাতীয় অং বং শোনার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

বুড়ুল একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ, বাস টার্মিনাস, কলেজ, ওপারে গড়চুমুক যাওয়ার ফেরি সব নিয়ে জমজমাট ব্যবস্থা। ঘাটটিও বেশ জমকালো। রায়পুর-বুড়ুল রাস্তার নিসর্গ অবলোকনের পর আমাদের গন্তব্য ফলতা।

বুড়ুল ঘাট থেকে ফলতা যাওয়ার প্রথাগত রাস্তা বিস্তর এঁকেবেঁকে নৈনান রোড ধরে সহরার হাট হয়ে। সহরার হাট, আগ্রহী পাঠক জানেন, পূর্বতন ম্যাকলিয়ড কোম্পানির ১৯৫৭ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া মাঝেরহাট থেকে ফলতা পর্যন্ত চলাচলকারী কালীঘাট-ফলতা রেলপথের শেষের আগের স্টেশন।

কিন্তু আমরা ওই রাস্তা ধরে যাব কেন! আমরা তো নদী দেখতে এসেছি - আর কে না জানে অটো হচ্ছে আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুমগন্ধরাশির মতন সর্বত্রগতি, সর্বত্রগামী। তাই এই দশ কিলোমিটার রাস্তাও আমরা নদী পার্শ্ববর্তী রাস্তা ধরে যাওয়াই স্থির করি। রাস্তার চেহারা দেখে মনে হলো এইগুলিই সরকারী ভাষার 'এক্সজ-জমিনদারি বান্ডস'। নদী এখানে উত্তাল, সঙ্গে প্রায় উল্টে ফেলার মত হাওয়া। নদী ধরে যতই এগিয়ে যাই চোখে পড়ে শীতকালে বনভোজন করার বাগানবাড়ি, কোলকাতা বন্দর অছির অফিস, নদীর জলের গভীরতা মাপা বুককাঠি।

একজন রেল ইতিহাস উৎসাহী হিসাবে জানি, ঐ রেলপথের ফলতা স্টেশনটি ছিলো তেঁতুলতলায়, নদীর ধারের এক অতিকায় তিন্তিড়ি বৃক্ষের নীচে। স্টেশন হারিয়ে গেছে - কারণ বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। তিন্তিড়ি বৃক্ষটি অদ্যপি পূর্ণ গরিমায় দন্ডায়মান। তার নীচে শঙ্কু আকৃতির তিন ঢিবি; লৌকিক দেবতা বিবিমা, দক্ষিণ রায় ও খয়েরবিবির থান। অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, জবরদখলি জমির ওপর গড়ে ওঠা কতিপয় ঘরের পুরনো ইঁট দেখে সেই দিনের কর্মব্যস্ত স্টেশনের ছবি মনে মনে এঁকে নিতে হবে। কোন রেল সামগ্রী, সিগন্যাল, রেললাইনের টুকরো, টুকরো বসার বেঞ্চি... কিচ্ছুটি নেই।

স্টেশনটি ওখানে হলেও টার্মিনাসটি ছিলো প্রায় ২০০ মিটার এগিয়ে, এখন যেখানে ৮৩ নম্বর বাসস্ট্যান্ড দাঁড়িয়ে। কামরাগুলিকে তেঁতুলতলায় ছেড়ে ৩০ ইঞ্চির ন্যারো গেজ ইঞ্জিনটি সেখানে যেত। সেখানে জল কয়লা নেওয়ার পর টার্নটেবিলে তাকে ঘোরানো হত। (এখনকার বিদ্যুৎ বা ডিজেলচালিত রেলইঞ্জিন দুদিকেই সমদক্ষতায় চলতে পারে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন এই সুখের সময় দেখেনি। তার নির্দিষ্ট সামনের দিক ও পিছনের দিক ছিল। একদিকের যাত্রা শেষ হলে তাকে টার্নটেবিলে উঠিয়ে মুখ ঘোরাতে হত। তবেই সে বিপরীত দিকের যাত্রা শুরু করতে পারতো) রেলের কোয়ার্টার ও অফিস নিশ্চিহ্ন; তার জমি বর্তমানে কোলকাতা বন্দর অছির দখলে। চঞ্চলা নদীর এত কাছে রেললাইন ছিল ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। জোয়ারের জল উপচে এসে রেললাইন ডুবিয়ে দিত না! তবে কীই বা আর করা যাবে। আসতে আমার কিঞ্চিৎ, মাত্র ষাট বছর দেরি হয়ে গেছে। রেললাইন বিলুপ্ত, স্টেশন নিশ্চিহ্ন, শুধু নদী বয়ে চলেছে একই নির্লিপ্ততায়। নিকটবর্তী কয়েকটি ঘরের ভিত অতি চওড়া- ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। পাশেই পুকুর। ঐ পুকুরের জল বাষ্পীয় ইঞ্জিন খেত।

ফলতা থেকে নূরপুর-রায়চক হয়ে ডায়মন্ডহারবার। এক শীর্ণ অটোর পক্ষে অনেকখানি রাস্তা। কিন্তু নদী সান্নিধ্য সেও উপভোগ করছিল।

প্রায় দু দশক আগে, পুত্র তখন দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তাদের ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকে মানবশরীরের নানা প্রত্যঙ্গের নাম কি ভাবে জড়পদার্থের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় তা নিয়ে একটি অনুশীলনী ছিলো- যথা face of a clock, leg of a chair, hands of a watch ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মধ্যে ছিলো mouth of a river। দেখা গেলো বস্তুটি কি, তা শ্রীমানের মাথায় ঢুকছে না। বই গুটিয়ে বাস ধরে তৎক্ষণাৎ ডায়মন্ডহারবার। বিস্তৃতা নদী, নৌকারাজি, উড্ডীয়মান জাতীয় পতাকা, ভগ্নপ্রায়দুর্গ, পরপারের ছায়ামাখা নিসর্গ - দেখে শ্রীমান তো মহাখুশি। তারপর ফেরার পথে মাছের আড়ৎ - বিকটদর্শন ও বিচিত্রদর্শন সামুদ্রিক মাছের সমাহার।

ডায়মন্ডহারবারের মূল আকর্ষণ কিন্তু নদী নয়। ভরা বর্ষায়, রাস্তার ধারে, ডায়মন্ডহারবারে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠে ভাতের হোটেল। তার পদ একটিই, ভাত ও ইলিশ। নেহাতই সাদামাটা চালের ভাত, সঙ্গে ইলিশের যা চাও তাই। তেল, ভাপা, ঝাল, ঝোল, অম্বল মায় পাতুরি অবধি। নেহাতই ঝোপড়ি, খেতে খেতে তোমার মাথায় ছাদ ফুঁড়ে বৃষ্টির জলও পড়তে পারে দু এক ফোঁটা। কিন্তু তাতে রাগ করলে চলবে না। এইরকমই এক ভোজনালয়ে বিলম্বিত মধ্যাহ্নভোজ। তারপর সারথিটি কোন কথা না বলে নদীতীরের পার্কের বেঞ্চে লম্বা হল। দেখাদেখি আমিও।

ওপরে আকাশ, ডাইনে বনস্পতি, বাঁয়ে নদী, নীচে ভূমি - ঘুম না এসে পারে? বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পঁয়তাল্লিশ। তারপর চা।

ফেরার পথে আর নদীতীর নয়, ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আমতলা মোড়। বাঁয়ে ঘুরে চড়িয়াল-বজবজ হয়ে বাড়ি।

বাড়ির সামনে অটো থেকে নামার সময় সারথিটির সস্নেহ মন্তব্য- "কাকা এটা তুমি ঠিক করলে না - কাকিমাকে তোমার নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

পশ্চিমবঙ্গ অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

একটি মফঃস্বলী বৃত্তান্ত

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু
পালাতে চাই যত সে আসে আমার পিছু পিছু...

একসময় এটাই মনে হত। সে অনেক অনেক দিন আগের কথা - আমি যখন ছোট ছিলাম।
কলকাতায় স্কুল পোশাকে আমার বয়সীরা, মাটির চায়ের ভাঁড়ে সকাল, ময়দানে সাদা পোশাকে ক্রিকেটারের দল, ধর্মতলার মোড়, মিনি মিনি বাস বাস, আমিনিয়ার বিরিয়ানি, শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ের নেতাজির মূর্তি, বাবার মুখে শোনা ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা - এরা সবাই আমায় ডাক দিত - ডাক দিত কলকাতা, সেই ছোট্টবেলা থেকে।
অথচ এত বছর পর আবার ফিরে আসার ইচ্ছে হল। আর সেই ইচ্ছেটাই ভ্রমণ হয়ে উঠল, আমার প্রথম পুরোপুরি একার ভ্রমণ। কলেজে পড়তে, হস্টেলে থাকতে একা যাতায়াত করতাম, কিন্তু সেই গন্তব্যের একটা শুরু আর শেষ ছিল, যেমন থাকে সব গন্তব্যে। আমার এই গন্তব্যে ওই শেষটা ছিল না। গন্তব্যের একটা নাম ছিল - রূপনারায়ণপুর, কিছু স্মৃতি ছিল এই পর্যন্ত। মনে হচ্ছিল, যাচ্ছি, কিন্তু কার কাছে যাচ্ছি? মা তো বসে নেই ভাতের থালা নিয়ে, তবে?
কিন্তু দেখলাম এভাবেই ফিরে আসা যায় হয়তো। প্রায় কিছু না ভেবে কোন কোন মানুষ যেমন নিরুদ্দেশে যায়। তাহলেই হয়তবা কোথাও পৌঁছানো যায় কখনও।
আনা লিওনোয়েন্স-এর কথা মনে হচ্ছিল এই সূত্রে। হয়তো তেমন কোন মিল নেই, তবুও। ভারতের দক্ষিণে এক ছোট শহরে জন্ম হয়েছিল আনার। আনার ঠাকুমা ছিলেন ভারতীয়, সম্ভবত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ছেলেবেলা কাটে ভারতবর্ষেই। বড় হয়ে যাওয়ার পর নিজের ভারতীয় শিকড়কে অস্বীকার করেছিলেন আনা। পরবর্তী জীবনে তাঁর একটা বড় পরিচয় ভ্রমণ লেখক। শেষ বয়সে ভারতবর্ষকে নিয়ে একটি ভ্রমণ কাহিনি লেখেন, যদিও চরিত্রগুলি ছিল কাল্পনিক। হয়তো ফিরে আসতে চেয়েছিলেন নিজের শিকড়ের কাছে। তাই তাঁর কলমে শেষপর্যন্ত ঠাঁই দিয়েছিলেন জন্মভূমিকে।

অবাধ্য জল হাতের পাতায় রয়না...

বৃষ্টি পেছোনো জুন মাসের অসহ্য গরমের এক সকালে যখন কলকাতা স্টেশন থেকে নাঙ্গাল ড্যাম এক্সপ্রেস ছাড়ল তখন মনে কেমন ভয়ানক একটা ফুর্তি হল, মনে হল এই মুহূর্তে আমার সামনে বা পেছনে কিছুই আর নেই, যেকোনদিকেই চলে যাওয়া যায়। অবশ্য আপাতত ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে যাওয়া ছাড়া গতি নেই -আক্ষরিক অর্থেই।
সুপারফাস্ট ট্রেন, প্রথম স্টপই আসানসোল। ছেলেবেলার লোকাল ট্রেন, হকার, ছানার গাড়িতে পা তুলে বসা - নাহ্ কিচ্ছু নেই। বেশ ফাঁকা কামরা, সাধারণ কামরাতেই আস্ত একটা সিটে শুয়ে বসে যাওয়া।
এই লেখার আরও একটা প্রাক্‌কথন আছে, সেটা বর্তমানের, এইবেলা সংক্ষেপে সেরে রাখি। আমার বাবা ছিলেন হিন্দুস্তান কেবলস উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক। ছোটবেলায় দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা বাবাকে যেমন ভয় পেত তেমনি শ্রদ্ধা করত। তেমনই এক পুরোনো ছাত্র বিজয়দাদা গত কয়েকবছর ধরেই আমাদের রূপনারায়ণপুর যেতে বলেছিল। এই বিজয়দাদাদের একটা ইস্ত্রির দোকান ছিল। অনেকগুলো ভাইবোন আর অনেকটা দারিদ্র্য। বাবার পরামর্শে, বিজয়দাদা কেবলসের হিন্দি মিডিয়াম থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর বিহারের কোনও কলেজ থেকে অনিয়মিত ক্লাস করে গ্র্যাজুয়েশন করে। আরও কিছু কিছু কোর্সও বোধহয়। গত বছর কেবলস-এর অফিসার পদ থেকে রিটায়ার করেছে। ভাইবোন, নিজের ছেলেমেয়ে সবাইকেই দাঁড় করিয়েছে যতটা সম্ভব। রিটায়ারের ঠিক আগেও বারবার করে ফোন করেছিল যাওয়ার জন্য। কিন্তু তখন সম্ভব ছিল না। এখন সেই বিজয়দাদাকেই খবর দিয়েছিলাম আসামী হাজির বলে। থাকার জায়গার খোঁজে। বাকী ঘোরা অথবা খোঁজাটা আমারই থাকবে।
একা যাব, একাই থাকব, একাই আমি বেড়িয়ে নেব এটা ঠিক মনঃপূত ছিল না আমার কাছের মানুষজনের - নিরাপত্তা, আমার শরীর গতিক এবং সর্বোপরি আমার মনমেজাজ এই সবই জোরদার অতি বাস্তব কারণ ছিল। কিন্তু ওই যে, অবাধ্য জল হাতের পাতায় রয়না...।
মা কিন্তু খুব খুশি। বলল, 'ফিরে এসে আমায় বলবি কেমন সব বদলে গেছে।' আর তার জন্যই বোধহয় লিখতে বসলাম।

Family is not about blood. It's about who is willing to hold your hand when you need it the most.

এটা আমার জীবনে খুব সত্য। আরও সত্য মনে হল এই ফিরে আসার অভিজ্ঞতায়। ট্রেন কিছুদূর এগোতেই বিজয়দাদার ফোন এল - কোথায় তুমি? বললাম। বিজয়দাদা বলল, আসানসোলে নেমে বাইপাসের বাস ধরতে, তাড়াতাড়ি হবে। গুরুদোয়ারায় দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্য। বিজয়দাদার বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে কেবলসের গেস্টহাউসে পৌঁছে দেবে। ওখানেই থাকব ঠিক করেছি।
সেই ধানক্ষেত, কলাগাছ, শালুকে ভরা ডোবা, মাঠ-ঘাট, বাড়ি-ঘর দৌড়ে দৌড়ে পেছনে যেতে যেতে বলে যাচ্ছে, ফিরে আসিস কিন্তু। যেমন বলেছে আমার হোস্টেলের বন্ধুদের গ্রুপটা - 'ক্ষেপীসসসস্' - ফেসবুকের পাতায়। 'পুরালোক বার্তা'-য় আত্মজীবনী লেখার অনুরোধ আসার পর থেকে হঠাৎ করেই পুরোনো বন্ধুদের খুঁজতে খুঁজতে এই আড্ডা ঘর তৈরি, এমনকী কুড়ি বছর পর আবার দেখাও পাঁচ বন্ধুতে। ওদিকে খুঁজে পাই ছোট্টবেলার এক হারানো বন্ধুকেও। সুমনের গান তখন মনের মধ্যে উথাল-পাথাল - 'বন্ধু কী খবর বল, কত দিন দেখা হয়নি'। এই সবই তো

ফিরে আসার ভ্রমণ। এসব ভাবতে ভাবতে ট্রেনে যেতে যেতেই রাণা দাদার ফোন এল - 'কতদূরে আছিস?' এও বাবার আরেক কাছের ছাত্র। ওরই মধ্যে দাদাসুলভ বকুনি - 'গেস্টহাউসে একা একা থাকবি, একদম না। আমার বাড়িতে এসে উঠবি...।' আমি খুব জোরে উত্তর দিই, 'কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিনা, পৌঁছে ফোন করছি।' ওরই ফাঁকে নিজের আনা কেক, ডিমসেদ্ধ টপাটপ খাই, আমার আবার খিদে পেলে কেমন পাগল পাগল লাগে কীনা!
সাড়ে দশটায় আসানসোল। স্টেশনে নেমে জনে জনে পৌঁছ-সংবাদ দিই। তারপর আমার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বিজয় দাদাকে প্রশ্ন করি, 'তোমাদের বাড়িতে কি দুপুরে খাব? নাহলে বল স্টেশন থেকে খেয়ে বেরোই। এই রোদ্দুরে একবার গেস্টহাউসে ঢুকে গেলে আর বেরোতে ইচ্ছা করবে না।' বিজয়দাদা উত্তর দিল, 'ঠিক ঠিক, তা এখানেই খেয়ে নেবে, আমাদের কিন্তু নিরামিষ।' বুঝলাম, নেমন্তন্নটা নিজেই নিলাম, তা যা হোক খাওয়া একটা জুটলেই হবে - আমি তো ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, এই আশা নিয়েই এসেছি। মা না হোক, কেউ তো অপেক্ষা করবে ভাতের থালা নিয়ে, তাই বা কম কি?
ডাল, ভাজা, তরকারি, মাছ - যেচে নেওয়া নেমন্তন্নটা বেশ ভালোই হল। এছাড়া বাড়ি ঢোকার পরপরই মিষ্টি, জল আর খাওয়ার শেষপাতে দই। মানে কিছুই বাকী রইল না আর কী। বিজয়দাদার বাড়ি এই প্রথম এলাম। টুকিটাকি আলাপ হল বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। আরেক ভাই অজিতদাদাকে আগে থেকেই চিনতাম। হাত ধুয়ে প্রশ্ন করলাম বিজয়দাদাকে, 'তবে তুমি যে বললে নিরামিষ, মাছ খেলাম তো।' বিজয়দাদার নির্বিকার উত্তর, 'নিয়ে এলাম। মাছটা ভালো ছিল তো?' ভালোবাসা মাখানো মাছ কি কখনও খারাপ হতে পারে?

ধরা যাক আজ রোববার কোন কাজ নেই
শুয়ে থাকা যাবে যত খুশি সারা বিছানায়

আমাকে পৌঁছে দিয়ে, সব বুঝিয়ে বিজয়দাদা চলে যেতেই আমি দরজা বন্ধ করে ফাঁকা ঘরে নেচে গেয়ে গড়াগড়ি খেয়ে...। বিকেলের দিকে দেবাশীষ এল, অনেক বছর পর ছোট্টবেলার এক হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা।

অতঃপর

বেরিয়ে পড়লাম ছায়া ঘনাতে। একাই। কিছুটা এগোতেই আবার পিছুডাক, গেস্টহাউসের ঘরের এসি টা বন্ধ করতে ভুলে গেছি - উফফ্ কী জ্বালা!

গেস্টহাউসটা কেবলসের অফিসার্স কলোনি চত্বরে। কেবলসের অর্থনীতির পতনের সাক্ষাৎ প্রভাব পড়েছে এখানে - পোড়ো ভিটের মতো পড়ে আছে অনেক কোয়ার্টার। গাছপালায় ঢেকে গিয়ে কেমন একটা রহস্যময় থমথমে। এই রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে নিয়মিত পড়তে যেতাম, তখন অনেক প্রাণচঞ্চল ছিল, কিন্তু এখন যেন বেশি রোমান্টিক। হাঁটতে হাঁটতে এগোই। শহরের মূল অংশে বাড়ি-ঘর ফ্ল্যাট-দোকান কেমন অচেনা কিংবা টিপিকাল মফঃস্বলী চেহারা নিয়েছে শহরটা যেটা আমাদের ছেলেবেলায় ছিল না। গুরুদোয়ারাটা রয়েছে, কিন্তু পাশের বহুতল হোটেলটা অনেক বেশি চোখে পড়ে।
আমার প্রথম বাড়িটা দূর স্মৃতিতে বড় রঙিন - খুঁজে পাইনা অন্ধকারে, মন খারাপ হয়ে যায়।

ছেলেবেলার পাহাড় আমায় ডাকে
হাওয়ায় হাওয়ায় মায়ের গন্ধ থাকে...

মনে পড়ে যায় কেমন ছিল আমার ছোটবেলার বাংলা-বিহার সীমান্তের এই শহর, এই বাড়ি - অনেকটা খোলা মাঠ, লাল মাটির রাস্তা, উঁচু-নীচু পাহাড়ি টিলা, মাঝেমধ্যে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা বাগানবাড়ি, ছবির মতো একটা স্টেশন। আর একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়ও ছিল, কিম্বা বলা যায় বেশ উঁচু একটা টিলা। একেবারে মাথায় একটা শিব মন্দির। ওই পাহাড়টায় কোনদিনই চড়া হয়নি আমার। অথচ স্কুল যাওয়া-আসার পথে বারবার ওকে দেখতে দেখতে কতবার ভেবেছি একদিন ঠিক যাব। কতবার বাবার কাছে বায়না করেছি পাহাড়টায় নিয়ে চল বলে। পুরোনো গল্প-উপন্যাসে বাঙালির পশ্চিমের হাওয়াবদলের জায়গাগুলোর যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমনই ছিল আমার ছেলেবেলার রূপনারায়ণপুর।
ছোটবেলায় স্কুলের ভূগোল বইতে সবাই পড়েছে চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন তৈরি আর রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবলস ফ্যাক্টরির কথা। তখন জেনেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের এটাই শেষ রেলস্টেশন। চিত্তরঞ্জন শহরটা পশ্চিমবঙ্গে হলেও স্টেশনটা নাকি বিহারে। এখন রূপনারায়ণপুর স্টেশনটাও ঝাড়খণ্ডে পড়ে কী না ভাবছিলাম স্টেশনের শেষ প্রান্তে 'ঝাড়খণ্ড রাজ্য মেঁ আপকা সোয়াগত হ্যায়' লেখা হিন্দি হোর্ডিংটা দেখে।

আমরা প্রথম যে বাড়িটায় ভাড়া থাকতাম, সেই বাড়িওলা থাকতেন কলকাতায়। এটা ছিল তাঁর হাওয়া বদলের ঠিকানা। বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিয়েছিলেন। বিরাট একটা বাগান ছিল - আম, জাম, পেয়ারা, কলা এমন অজস্র ফলের গাছ ছিল সেই বাগান জুড়ে। বারান্দার একপাশে ছিল একটা মাধবীলতা। জ্যোৎস্না রাতে কামিনী গাছের নীচটা এমন সাদা হয়ে থাকত যে মনে হত এক মুঠো জ্যোৎস্না জমে আছে ওখানে। পাঁচিলে চড়ে কল্কে ফুল পেড়ে তার মধু খেতাম। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা মহুয়া গাছ ছিল। ফুলের গন্ধে ম' ম' করত গরমের কোন একটা সময়ে। বাগানের পেছনের দিকটা ছিল ঝোপ-জঙ্গল - সেখানে আমার আর দাদার একটা গুহা ছিল, যার ভেতরে ঢুকে আমরা গল্প করতাম। সেই জঙ্গলে আমরা একটা নারকেলি কুলের গাছ আবিষ্কার করেছিলাম একদিন। খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে শাঁকালু তুলে খাওয়া হত। একবার মনে আছে এতবড় একটা শাঁকালু বেরিয়েছিল যে বাবা-মাকে ডেকে আনতে হয়েছিল। লাল-হলুদ কেনা ফুলের গাছও ছিল মনে পড়ে। যখন খুব বৃষ্টি পড়ত তখন হলুদ-মাখা আঁচলের আমার তরুণী মা আমাদের বৃষ্টিতে ভিজিস না ঠাণ্ডা লাগবে বলে নাচতে নাচতে বাগানে চলে যেত আর ঝুপ্পুস হয়ে ফিরে আসত।
অনেকদিন পর গিয়ে দেখেছি জমিটা টুকরো টুকরো হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়িটাও খানিক বদলে গেছে শুধু বাড়ির সামনের ঘোড়ানিম গাছটা সেই একইরকম দাঁড়িয়ে আছে। সেও প্রায় বছর পনেরো আগে।
কতকিছুই তো মনে পড়ে যায় - বর্ষার দিনে জলে কাগজের নৌকা ভাসানো - দাদার না আমার কার নৌকা গেল আগে, কারটা বা কাত হয়ে পড়ল। কতকিছুই তো মনে পড়ে যায় - মুড়ির টিনে চড়ে স্কুলে পাড়ি। মুড়ির টিন মানে সে গাড়িতে চড়লে ঝাঁকুনিতে নিজেকে ঝালমুড়িসদৃশ মনে হবে। কতকিছুই তো মনে পড়ে যায় - দাদাতে আমাতে মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চলমান বায়োস্কোপ দেখা...। মণিমেলার মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা, পুতুলনাচ, অথবা সেই বহুরূপী - তাকে তো আজকাল আর দেখতেই পাইনা কোথাও।

তারপর...

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে পৌঁছাই। খুব প্রিয় একটা জায়গা। তথাকথিত আত্মীয়বিহীনভাবে বড় হয়েছি। বিপদেআপদে সবসময় দেখেছি স্টেশনের কাকা-কাকিমা আমাদের আগলে রাখত। স্টেশনের কাকা - জয়ন্ত ব্যানার্জি ছিলেন রূপনারায়ণপুরের স্টেশন মাস্টার । ছোটবেলায় দরকারে-অদরকারে কতদিন কেটেছে স্টেশন লাগোয়া ওঁদের কোয়ার্টারে। স্টেশন কোয়ার্টারের চেনা চত্তর ঘিরে এখন পাঁচিল উঠেছে। ওপাশে একটা শিবমন্দির আছে, ওই জায়গাটা বেশ ভুতুড়ে লাগত ছেলেবেলায়। সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে আসি। আগের তুলনায় লোকজন বেশি রয়েছে - বয়স্কদের সান্ধ্য আড্ডা, বাচ্চাসহ স্বামী-স্ত্রীর সান্ধ্য ভ্রমণ, অল্পবয়সীদের গল্প, সবই চলছে। একা একা হাঁটি, মালগাড়ি চলে যায়, কামরা গুনিনা আর ছেলেবেলার মতো, দাদাই নেই সঙ্গে, ঝগড়াটা করব কার সাথে? ওভারব্রিজেও উঠলাম না। অমৃতসর মেল চলে গেল। বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি তিন ভাষায় 'রূপনারায়ণপুর' লেখা বোর্ডটা প্ল্যাটফর্মের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছুঁয়ে ফিরে আসি, সেই ছোট্টবেলার খেলাটা খেলে নিই একা একাই।
মনটা বৈকালিক চা-চা করছে, অন্ধকার হয়ে গেছে পুরোপুরি, খিদেও পেয়েছে জোর। ডাবর মোড়ের দিকে হাঁটা দিই। এটাই আমাদের শহরটার কেন্দ্রস্থল, বাজার সবকিছু। পুরনো দোকানের মধ্যে কল্যাণেশ্বরী মিষ্টান্ন ভান্ডার, রাজা মিষ্টান্ন ভান্ডার, ওষুধের দোকানটা, সুভাষদাদার স্টেশনারি দোকানটা খেয়াল করি। মোড়ের ঠিক আগে নিখিল স্যারের বাড়ির একটা জানলায় টিমটিমে আলো চোখে পড়ে। কাল কড়া নেড়ে দেখতে হবে। আপাতত কল্যাণেশ্বরীতে ঢোকা যাক।

রাণাদাদা বারবার ফোন করছিল আর কোথায় জিজ্ঞাসা করছিল। এবার আমিই ফোন করি। 'কোথায়' এর উত্তরে জানাই, 'কাছেই আছি, ডাবর মোড়ে, কল্যাণেশ্বরীতে বসে নস্টালজিক সিঙাড়া খাচ্ছি।' বাইক নিয়ে রাণাদাদার আবির্ভাব হয়। দেখা হয় জিতেন স্যারের সঙ্গে। আমি যদিও কোনদিন ওনার কাছে পড়িনি। হঠাৎ পাশ থেকে হাতে টান পড়ে - 'দময়ন্তী না'? ফিরে দেখি শিবানী কাকিমা। ভারি আনন্দ হল। জড়িয়ে ধরলাম। কাকিমার কাছে ছবি আঁকা শিখতাম একটা সময়ে, তখন বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। এরপর কোল্ড ড্রিঙ্কস থেকে চা আর চিংড়ি ও ভেজিটেবল বড়া - আরেক প্রস্থ খাওয়া আর গল্প রাণাদাদাদের বাড়িতে। রাতে ফেরার সময় বিজয়দাদার বাড়ি থেকে রুটি আর লাউয়ের তরকারি সংগ্রহ করি এবং তরকা কিনে দেওয়ার অফার জোরের সঙ্গে অগ্রাহ্য করি - মানুষ তো, হাতি তো নই।
বিজয়দাদা পৌঁছে দিয়ে যায় আবার গেস্টহাউসে। নির্ধারিত লোডশেডিং-এর সময়টুকু পার করে আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে খুব সাবধান করে বিদায় নেয়। দরজা বন্ধ করে ধপাস করে শুয়ে পড়ি, পেট পুরো ভর্তি।
একা একা রাত জাগি বেশ লাগে, গান শুনি নোটবুকে, তাও বেশ লাগে। এক ফাঁকে কোনওমতে খেয়ে নিই। তারপরে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি।

বাড়িটা আছে...

শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায়। কবিতা লিখি। তারপর স্নান করে আরেকটু গড়াগড়ি দিয়ে অনেকটা চা তেষ্টা নিয়ে রূপনারায়ণপুরের সকাল দেখতে বেরিয়ে পড়ি। কাল রাতেই বিজয়দাদা একটা সুখবর দিয়েছে - বাড়িটা আছে, ঘোড়ানিমগাছটাও।
হাঁটতে হাঁটতে কোনও চায়ের দোকান চোখে পড়ে না। রাস্তার ডানহাতে একটা কনস্ট্রাকশনের জায়গায় নোটিসে চোখ আটকায় - 'এখানে ভদ্রলোকেরা কেউ নোংরা করবেন না'। খুবই অর্থবহ!
অচেনা ফ্ল্যাটবাড়ি, দোকানঘর কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলি - লোকজনও আমায় দেখে কৌতূহলী চোখে।

আরে ওই তো বাড়িটা - আচ্ছা, বাড়িটার সারা গায়ে যদি সিমেন্টের বিজ্ঞাপন মারা থাকে তাহলে ওকে চিনব কী করে? কেমন একটা দরকচা মারা চেহারাটা, যেন এমনটা হওয়ার ছিল না ওর। বুকের মধ্যে কষ্ট পাক খায়। তবু না থাকা অথবা হারিয়ে যাওয়ার থেকে ঢের ভালো, নিজেকেই আশ্বাস দিই। ঘোড়ানিম গাছটা বরং পুষ্ট হয়েছে আরও, আরও গভীরে হয়ত ছড়িয়েছে শিকড়। আরও সবুজ হয়েছে পাতাগুলো ঘন হয়ে - এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল ওর। ওর গায়ে আদরের হাত বোলাই, জড়িয়ে ধরি, হেলান দিয়ে দাঁড়াই।
এক অবাঙালি ভদ্রমহিলা বাড়িটায় ঢোকেন। তাহলে লোকজন আছে, আমিও উৎসাহিত হয়ে ডাকাডাকি করি। ভদ্রমহিলাকে বলে ঢুকেও পড়ি বাড়ির গেট খুলে - বত্রিশ বছর পর আবার পা রাখি ওর আঙিনায়। ঘরের মেঝেটা যেখানে মাটিতে শুতাম গরমের দিনে মায়ের সঙ্গে ভাইবোনে, একইরকম রয়েছে। উঠোনটা ছোট হয়ে গেছে, ওখানে আমাদের স্বল্পকালীন পোষা কুকুর ব্ল্যাকি বাঁধা থাকত, যার থাপ্পড়ের ক্ষতের সেলাইয়ের আবছা দাগ আজও আমার মাথায় রয়ে গেছে। মায়ের কয়লার ঘরটা এখন নাকি রান্নাঘর হয়েছে। বেরিয়ে এসে পাঁচিলটার গায়ে আদরের হাত বোলাই - কত বসে থেকেছি ওর ওপরে, একা বা ভাই-বোনে। কত ঝগড়া-খুনসুটির সাক্ষী ও। এই মহিলাদেরই এখন বাড়িটা। বুঝলাম মূলত সিমেন্টের গুদাম হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। আঙুল তুলে দেখাই - ওই যে ওইখানে গেট ছিল আর ওর গায়ে মাধবীলতা গাছ। এপাশে একটা কল্কে ফুলের গাছ ছিল, আমরা মধু খেতাম ফুল পেড়ে, ওখানে কামিনী গাছটা সাদা হয়ে থাকত। ভদ্রমহিলার মুখে স্বাভাবিকভাবেই কোন আবেগ ফোটে না। আসলে আমিও তো নিজেকেই বলছিলাম আর বাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছিলাম হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলাটাকে, যেরকমই হয়ে যাক আজ, তবু তো আছে - 'অমল, সুধা তোমাকে ভোলেনি'।
স্টেশনের রাস্তাটার মুখে একটা খাবার দোকান। গরম গরম কচুরি ভাজছিল। না, কচুরির খিদে এখনও পায়নি। চা খাই মাটির ভাঁড়ে আর নিজের ঝোলা থেকে বার করে বিস্কুট। হাঁটতে হাঁটতে ডাবর মোড়ের কাছে পৌঁছাই। নিখিল স্যারের বাড়ির চেনা গেট খুলে ঢুকে পড়ি। দরজায় কড়া নাড়ি। 'কে'-র উত্তরে নিজের ডাক নাম চেঁচিয়ে জানান দিই, বলি, 'দরজা খোল।' ছোটবেলা থেকেই যাতায়াত ছিল এই বাড়িতে। ওরা তিন ভাই। মাঝের জন দাদার সহপাঠী আর ছোটজন আমার। এখন সকলেই যে যার কর্মক্ষেত্রে। বড় গৌতমদাদাই চাকরি ছেড়ে বাবাকে আগলাচ্ছে। একটা চোখে এখন দেখতে পাননা স্যার। পুরোনো স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলেন। গল্প জমে উঠল পেশায় ফটোগ্রাফার গৌতমদাদার সঙ্গে। আগে কখনও এত কথা হয়নি, কিন্তু ছেলেবেলা মানুষকে কাছে টানে। কাকিমার অভাব বড্ড অনুভব করি। তালের বড়া মনে পড়ে, তালক্ষীর - রান্নাঘরে বসে খেয়েছিলাম। গৌতমদাদা চা বানিয়ে আনে, বাড়িতে বিস্কুট নেই। আমি বাধা দিই, বলি, 'বেরোতে হবেনা, আমার সঙ্গেই আছে', ভাগ করে খাই। গৌতম দাদা আম নিয়ে আসে - 'বাড়ির গাছের খাস', বলি, 'আর দুটো দাও, মেয়ের জন্য নিয়ে যাব।' আম অথবা ছেলেবেলা কী নিয়ে যাব কে জানে! বুকের মধ্যে টনটন করে, চট করে বেরিয়ে পড়ি।
ফের কল্যাণেশ্বরীতে আটকে যাই। নাহ্, আমার কপালে ল্যাংচা নেই। পান্তুয়াতেই সান্ত্বনা পাই। চেনা চেনা মুখের দোকানদারের সঙ্গে গল্পও জমাই খানেক - ছোটবেলার ল্যাংচার বিলাপ। আরও খানিক এগোতে হঠাৎ একটা বাইক থামে। 'দময়ন্তী না?' পুরোনো সহপাঠীর হাসিমুখ - সন্দীপ, একসঙ্গে ইলেভেন-টুয়েলভে পড়েছি। ভীষণ খুশি হয়ে উঠি। রাস্তাতেই খানিকক্ষণ আড্ডা চলে। স্কুলে পড়াচ্ছে, বিয়ে করেছে আর তারপরে ছেলেবেলা। দেবীর কথা ওঠে। অন্য ভুবনে চলে যাওয়া বন্ধুর স্মৃতিতে মন ভারি হয়ে যায় দুজনেরই। ফোন নম্বর বিনিময় হয়, ফেসবুকের পাতায় দেখা হবে আবার। যাওয়ার সময় জীবনের সেরা কমপ্লিমেন্টটা দিয়ে যায় - 'তোর বয়স, আমাদের সঙ্গে যখন পড়তিস তার

চেয়েও কমে গেছে মনে হচ্ছে!' - বিস্ময়ে জাগে আমার প্রাণ!
হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, সন্দীপ, আমাদের দোল খেলার কথা মনে আছে তোর? জিজ্ঞাসা করা হল না। সেই প্রথম আর সেই শেষ বন্ধুদের সঙ্গে আমার দোল খেলা।
আরেকটা পুরোনো বাড়ির পাশ কাটিয়ে যাই। রাস্তার ধারেই, দোতলায়। দেখলাম বারান্দায় একটা একা টবে গাছ রয়েছে। ছোটবেলায় ব্রেস্ট টিউমার অপারেশনের পর এই বাড়িতেই প্রায় দেড়-দু'মাস গৃহবন্দী ছিলাম। ওই বারান্দায় বসে সতেরো বছর বয়সে রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ছিলাম এক বিকেলে - কি যেন কথাগুলো, এখন আর সব মনে নেই, মানেটা ছিল - কোন সুদূরের সপ্তদশী এই কবিতা পড়তে পড়তে ভাবছে কবি বেঁচে থাকলে বোধহয় আমাকেই ভালোবাসত। পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, অত বছর আগে এমন করে সেটা কবি বুঝল কী করে! ওই বাড়ির ছাদেই তো একা একা শুয়ে রোদ্দুরে পুড়তাম অথবা রাতে তারাদের সঙ্গে আর দিনে গাছেদের সঙ্গে কথা বলতাম।
হাঁটতে থাকি। রাস্তায় যেন দেখতে পাই ছোট একটা মেয়েকে, নানা বয়সে। সুমনের কবিতার লাইন মনে পড়ে -

"দেখছি তোকে ওই তো ছোট্ট
ফ্রক পরা তুই ঝালর চুল,
হাঁটতে হাঁটতে চললি কোথায়
পাঠশালা না গানের স্কুল ?

দেখছি তোকে...

দেখছি তোকে বছর গুলো
ছুট্টে গেল কোথায় বল্,
ভাবতে ভাবতে চলছি আমি
আমরা দুজন গাইব চল ।

দেখছি তোকে...

শুনছি তোকে কথার নিছক
উচ্চারণে ছন্দময়,
চলতে চলতে শুনছি আমি
দ্যাখ কী করে বয়স হয় ।

দেখছি তোকে...

গাইছি তোকে আমার ছোট্ট
'আমি'র মতো স্মৃতির সুর,
গাইছি তোকে একলা যাব
আমরা দুজন অনেক দূর ।"

নাহ্, উলুর-ঝুলুর চুল আমার ছিল না কোনদিনই, বাবার বকুনির ভয়ে, হয় টানটান করে বাঁধা, নয় ছোট করে ছাঁটা। তবু যেন কবিতায় নিজেকে দেখতে পাই। যেমন কলকাতার পথে মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে যায় সদ্য কলকাতায় আসা কিচ্ছু না-চেনা না-জানা বছর কুড়ির ক্যাবলা মেয়েটাকে।

অমলা নার্সিং হোমের সামনে পৌঁছাই। ডাক্তারকাকুর কথা মনে পড়ে খুব। পুরনো সিনেমার চরিত্রের মতো একটা মানুষ। এখন আর এখানে থাকেননা জানি। একবার ঠিকানা খোঁজার কথা মনে হল, তারপরে মনে হল থাক। কেন, কে জানে! বাঁ হাতের গলিটা দিয়ে ঢুকে গেলে আরেকটা ভাড়া বাড়ি। তখন একতলা ছিল, এখন দোতলা হয়েছে, রঙ হয়েছে। এই বাড়িতে দেবীর সঙ্গে কত আড্ডা মেরেছি। 'হিতেন স্যারের মেয়ে না', ডাক শুনে ভাবনা ছিঁড়ে ফিরে আসি। 'আমি সকাল থেকে দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমাদের পুরনো বাড়ির সামনে যখন ছবি তুলছিলে তখনই বুঝলাম হিতেন স্যারের মেয়ে। কেমন আছ? এখানে কোথায় উঠেছ?' মুখ চিনতে পারি বয়স্ক ভদ্রলোকের, নাম মনে পড়ে না, কথা গাঁথা হয়।
রাস্তা পার হয়ে মিনিবাসে উঠে বসি। গন্তব্য ছোট্টবেলার ইস্কুলটা। জানলার ধারে বসি - রূপনারায়ণপুর পেরিয়ে, কেবলস পেরিয়ে চিত্তরঞ্জনের দিকে এগোই। ডানহাতে হাইস্কুল, বাঁ হাতে দূরে কাঙ্কুই পাহাড়। ছবি তোলার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, যাহ্। আসলে সব কেমন ম্রিয়মান যেন। চিত্তরঞ্জনে আমলাদহি স্টপে বাস দাঁড়ায়, দাঁড়িয়েই থাকে। ভেতরে যাত্রীরা ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকে গরমে আর বিরক্তিতে। উল্টোদিকের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি কতটা বদলেছে। এটাই এই শহরটার মূল বাজার এলাকা। খুব ঠাহর হয় না, তবে কেমন ফাঁকা ফাঁকা, অবশ্য যা গরম পড়েছে।
শ্রীলতা ইনস্টিটিউটের কাছে বাস থেকে নামি। বাঁহাতে স্টেডিয়াম পড়ে, আরেকটু এগিয়ে শ্রীমতী সিনেমা হলটা। ছোটবেলায় উৎসুক হয়ে থাকতাম কখন আমাদের দেখার মতো সিনেমা আসবে। জীবনের প্রথম ইংরেজি সিনেমা - 'বেনহুর' আমার শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আর 'ফটিকচাঁদ' সিনেমার সঙ্গে 'পিকু'। বড়দের সিনেমা - কার কার বাড়ি থেকে শুরুতে নিয়ে যাবে, কে কে বঞ্চিত? স্কুলে তাই নিয়ে জোর আলোচনা। টিভি, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বঞ্চিত শৈশবে কিছু পাওয়ার আনন্দটা অনেক বেশি ছিল, যেটা আজকের বাচ্চাদের কাছে দুর্লভ।

সিনেমা হলের সামনে একটা আচারওয়ালা বসত। ওকে আমার মনে আছে রুমিয়ার জন্য। রুমিয়া নিজেও ওর কাছ থেকে নানারকম আচার আরও কীসব কিনে খেত আর আমাকেও টেনে নিয়ে খাওয়াতো। আমার কাছে বাসভাড়া ছাড়া বাড়তি পয়সা থাকত না। তাই ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম প্রাণপণে। কিন্তু ঠিক হাত ধরে টেনে এনে খাওয়াবেই। নাহ্, আমি কোনদিন ওকে কিছু কিনে খাওয়াইনি, মনে পড়ে না। এভাবে আমাকে আর কেউ...নাহ্, তাও না।

দেশবন্ধু বুনিয়াদি বিদ্যালয়, পশ্চিম আমলাদহি -র কাছে পৌঁছাই। যাব্বাবা, পাঁচিল উঠল কবে!? স্কুল তো বন্ধ, গরমের ছুটি চলছে, তালা ঝুলছে গেটে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবি পাঁচিলটা ডিঙোব? না হলে স্কুলের গায়ে হাত রেখে বলে আসা হবে না তো আমি এসেছি, ভুলে যাইনি ওকে। দুটি ছেলে মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। হিন্দিতে যা জিজ্ঞাসা করে তার সোজা অর্থ - আমি এখানে উঁকিঝুঁকিই বা দিচ্ছি কেন আর ছবিই বা তুলছি কেন? বলি, এ আমার ছোটবেলার স্কুল। হ্যাঁ, হিন্দিতেই বলি। আমি লালমোহনবাবুর মতো চমৎকার হিন্দি বলতে পারি সে সার্টিফিকেট আমার মেয়েই দিয়েছে। শুনে দিব্যি বুঝে যায়। আমিও গেটের ফাঁক দিয়ে স্কুলের মাঠের একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে প্লাস্টিকে পুড়ি। তারপর স্কুলটাকে ঘিরে চক্কর মারি, যদি কোথা দিয়েও ঢোকা যায়। পেছনটা বেশ উঁচু ঠেকে, কিছুটা জঙ্গল হয়ে রয়েছে। বীরদর্পে এগোই। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে - বুড়োবয়সে ভদ্রমহিলার কি ভীমরতি ধরেছে! - মনে মনে ভাবে আন্দাজ করি। নাহ্, পাঁচিল আরও উঁচু। ছবি তুলেই ক্ষান্ত দিই। একটু মনখারাপই লাগে ফিরে আসার সময়, ক্লান্তও। বাসে উঠে বুঝি খিদেও পেয়েছে খুব। শেষ বিস্কুটটা চিবোই আর গ্লুকশ-ডি গলায় ফেলে জল খাই। হাইস্কুলে নামি না আর। এই স্কুলটার সঙ্গে অনেক দুঃখের স্মৃতি, নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে না।

স্কুলের বড় মাঠের পাশ দিয়ে বাস এগোয়। এখানে স্পোর্টস হত। আমি অবশ্য ওই শুরুতে পদাতিকদের দলেই এবং মাঠের কিনারে দর্শক চিরকাল। হায়ার সেকেন্ডারির বিল্ডিংটা জঙ্গলে ঢেকে আসছে ক্রমশঃ। মনখারাপ। বরং দেবাশীষকে ফোন করি - 'আমি ফিরছি, সকাল থেকে প্রায় কিচ্ছু খাইনি, তুই কিছু খাবার নিয়ে আয়, নাহলে স্রেফ মারা পড়ব।' গেস্টহাউসে ফিরে ঘাসগুলো ওর মাথায় ঢেলে দিই, বলি, 'চিবো'। আমি ওর আনা কেক চিবোতে থাকি।

দুপুরে রাণাদাদাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। দুরকম মাছ দিয়ে জোর খাওয়াদাওয়া। আজ গেস্টহাউসে লোকজনের ভিড়, রাতে থাকা যাবে না। রাতে রাণাদাদাদের বাড়িতেই থাকা-খাওয়ার নেমন্তন্ন। দুপুরে ফিরে যাই, এসি ঘর ছেড়ে দিতে হবে বিকেলে, অতিথিরা আসবেন। বিকেলে মালপত্র একটা নন-এসি রুমে রেখে তালাচাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি রাণাদাদার সঙ্গে আমার অভিযানে। আজকে আমার ভিআইপি খাতিরে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়েছে সে।

প্রথমেই পাড়ি দিই জেমারির দিকে। রূপনারায়ণপুরের দিক থেকে বাসুদেবপুর-জেমারি যেতে রাস্তার ডান হাতে পড়ে বাড়িটা। পাকাপাকিভাবে রূপনারায়ণপুর ছেড়ে আসার আগে এখানেই শেষপর্বে থেকেছি আমরা। বাবার মুখে শুনেছিলাম শম্ভুনাথ পন্ডিতদের নাকি জমিদারি ছিল, তাঁদেরই আদত বাড়ি, অবশ্য সত্যি-মিথ্যে জানিনা। এই বাড়ি আর জমিটা প্রথম বাড়িটার থেকেও অনেকটা বেশি - বিঘে দুয়েক তো বটেই। তবে দুটো বাড়ির ধরণটা আলাদা। আম-জাম-কাঁঠাল এমন অজস্র ফল আর কল্কে-কামিনী-গন্ধরাজ-মাধবীলতায় ছাওয়া প্রথম বাড়িটার ধরন ছিল বাঙালি। এই বাড়ির বিশাল-বিশাল ঘর, দরজার ওপরের কারুকাজ সব কিছুটা মধুপুর-জসিডি-শিমুলতলার বাড়িগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। বাগানে বেল গাছ ছিল একাধিক। একটা বোধহয় আমগাছ। পিছনে পলাশ গাছ বেশ কয়েকটা - গরমের সময়ে আগুন-লাল হয়ে ফুটে থাকত। মনে আছে রাতে বেল পড়ত ঠক ঠক করে আর ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠতাম। এই দুটো বাড়িতেই আমাদের বেশ বড় রকমের চুরি হয়েছিল। অবশ্য এই বাড়িটা যেরকম কেউ খুন করে রেখে গেলেও চট করে বাইরে থেকে কেউ টের পাবেনা। আমার একমাত্র ভূতের গল্পটা এই বাড়িটাকে নিয়েই লিখেছিলাম।

মা বলেছে, বাউড়ি পাড়াটা আছে কিনা দেখে আসতে। ওইখান থেকেই তো উঠে আসত মায়ের গল্পের চরিত্রগুলো। তাই পরবর্তী গন্তব্য রূপনারায়ণপুর গ্রাম। গ্রামের সেই রাস্তাটার মুখে বাউড়ি পাড়াটা তেমনই আছে। শুধু আগে গ্রামের মাটির বাড়িগুলো থেকে ওদের আলাদা করে কখনও চোখে পড়েনি আমার। এখন শ্রেণীবৈষম্য প্রকটভাবে চোখে লাগল। বাকি গ্রামটা ঝকঝকে পাকা বাড়ি আর বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে শহর হয়ে

গেছে, ওদের খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়িগুলো আলগাভাবে লেগে রয়েছে তার সামনে। মাটির দাওয়ায় দুই কিশোরী বসে আছে - সময়ের সঙ্গে শুধু বদলে গেছে পোশাক, বাউড়ি পাড়ার দারিদ্র্যের গায়ে আধুনিকতার এই ছোঁয়াটুকুই চোখে লাগল। 'রূপনারায়ণপুরে ফ্ল্যাট উঠবে, কোনদিনও ভাবতে পেরেছিলিস?' রাণাদাদার গলা ভেসে আসে। মাথা নেড়ে বলি, 'না'। এমনকী বোধহয় এখনও ভাবতে পারছি না, মনে মনে বলি। যেমন সবার গায়ে সব পোশাক মানায় না, তেমন যেন মফঃস্বলের এই শহরটায় মানায় না ওই উঁচুতলা ফ্ল্যাটবাড়িগুলো, রাঙামাটির পথে সিমেন্টের বাড়ি অবধিই বোধহয় ঠিক ছিল। 'কোথা থেকে এত মানুষ আসছে জানিনা, দলে দলে মানুষ আসছে। আগে শুধু চিত্তরঞ্জনের লোকজনই এখানে বাড়ি বানাতো। এখন যারা আসছে তাদের একটা বড় অংশই অবাঙালি। ফলে বাঙালি সংস্কৃতির যে একটা চল ছিল, সেটা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। শহরটা পুষ্ট হচ্ছে মূলতঃ কয়লার টাকায়। কেবলসের অবস্থা তো খুব খারাপ। মাইনেপত্র দিচ্ছে না।' যেতে যেতে আরও অনেক কথা শুনি রাণাদাদার মুখে। কেবলসের স্কুলেই শিক্ষকতা করে রাণাদাদা। তবে বৌদির স্কুলের চাকরি আর নিজের অজস্র টিউশনি এটাই বেশি ভরসা। অথচ স্কুলের টাকাতেই চলছে কেবলস। কর্মীদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বাইরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই এখন বেশি। বাইরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা টাকা ফি নেওয়া হয়। স্কুলফান্ডের এই টাকাতেই এদের যত মিটিং, অনুষ্ঠান চলে। অফিসারদের কোয়ার্টারগুলো এখন মোটা টাকায় ভাড়া দেওয়া হচ্ছে বাইরের লোকজনকে। অর্থ এভাবে একরকম আসছে কিন্তু কর্মীরা মাইনে পাচ্ছেননা মাসের পর মাস।

সীমান্ত পল্লীতে আমারই নিজের একসময়ের থাকা দুটো বাড়ি খুঁজে বের করে আমাকেই দেখায় রাণাদাদা। সত্যি বাড়িঘরের মানচিত্র এখানে এত বদলে গেছে যে গলিগুলো চেনা বেশ শক্ত হত। এবার বলি, 'স্টেশনের কাকাদের বাড়িতে যাব।' সে ঠিকানাও একজনের কাছ থেকে জেনে নেয়। চলতে চলতে আরও কথা হয়। একই কথা সকালে সন্দীপও বলছিল, 'যে দ্যাখ, এতবছরেও দুটো জিনিস রূপনারায়ণপুরে কিন্তু হল না। একেবারে বেসিক দুটো জিনিস - শিক্ষা আর স্বাস্থ্য। একটা ভাল হাসপাতাল বা নার্সিং হোম নেই। কারোর অসুখ করলে হয় আসানসোলে যাও, নাহলে দুর্গাপুর। আর শিক্ষা বলতে ওই একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যা হয়েছে।' এই কথাটা আবারও শুনেছি অন্যদের মুখেও। আসলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই তো গ্রাম আর মফঃস্বল শহরগুলোর চিত্র এটাই। এদিকে কলকাতায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে প্রাইভেট হাসপাতাল, নার্সিং হোম। মনে মনে ভাবি সমস্যার মূলটা কোথায়? রুগীর তো অভাব নেই কোথাও, তাহলে ব্যবসাটা (হ্যাঁ, স্বাস্থ্য এখন তো একটা বড় ব্যবসাই) কেন বড় শহরকেন্দ্রিকই রয়ে যাচ্ছে? তাহলে কি শহরের সুযোগ সুবিধা ছেড়ে ডাক্তারেরা আসতে চাইছেন না গ্রাম-গঞ্জে, কে জানে!?

ছোটবেলায় এই এলাকাটা পুরো ধানক্ষেত ছিল। সেই ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায় একসময়ে কত বেড়িয়েছি। মাঝে মাঝে আরো খানিক হেঁটে চলে যেতাম পুকুর ধারে। ওটাই ছিল শ্মশান। ধোঁয়া উঠতেও দেখেছি অনেকসময় মনখারাপের শেষ বিকেলে।

নস্টালজিক হই কাকাদের বাড়ির সামনে এসে। আমরা থাকার সময়েই চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করার পর স্টেশনের কাকারা এখানে চলে আসেন। পাশের জমিটা একসময়ে আমাদেরই ছিল - বাবার তোলা পাঁচিলটাও রয়েছে দেখলাম। ওই পাঁচিল ধরে-ধরেই তো আমার প্রথম সাইকেল শেখা অনেক বড় বয়সে - সেও এক কাহিনি। বছর তিরিশ ধরে বাড়ি বদল করতে করতে শেষে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে রূপনারায়ণপুরেই পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বাবা-মায়ের। কিন্তু ততদিনে আমরা দুই ভাইবোনই ঠিক করে ফেলেছি রূপনারায়ণপুরে থাকব না।

গাছপালা হয়ে কাকাদের বাড়িটা যত না বদলেছে, তার চেয়েও বদলেছে পুরো জায়গাটা অনেক বাড়ি ঘর উঠে - আমাদের সেই জমিটাতেও এখন বাড়ি বানিয়েছেন কেউ। বেশ কয়েকবার হাত বদলও হয়েছে জমিটা কাকার কাছে শুনলাম। শুধু পুরোনো পাঁচিলটা রয়ে গেছে। দিনের বেলায় এলে হয়তো আরও মনখারাপ লাগত, এই ভালো। কাকাদের বাড়িতে ঢুকে ডাক দিই। 'কে'-র উত্তরে যথারীতি নিজের ডাকনাম বলে চেঁচাই। কাকা বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে ভীষণ অবাক, খুব খুশি এবং একা এসেছি জেনে অসম্ভব রাগত সব একসঙ্গে হতে থাকে। কাকিমা পুজো করছিল। কাকা ডাকাডাকি করে। কাকিমা এলে জড়িয়ে ধরি আমি। নাহ্, পূর্ব পরিচিতদের কাউকে দেখে ঝপ করে জড়িয়ে ধরা আমার একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ, বরং অন্য কেউ করলে বিরক্তই হই। কিন্তু এবারে সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, আর সেই গন্ডগোলটাই ভালোলাগছে। আমার একার আসার কাহিনি শুনে কাকিমা স্নেহময় গলায় বলল, 'একই রয়ে গেল। সেই ছোটবেলায় বলত, আমার এখন রাগ হয়েছে, আমি কথা বলব না। দেখে মনে হচ্ছে সেই ছোট মেয়েটাই।' আমি বলি, 'আমার মেয়ের বয়সই ষোল!' সেই শুনে আরেকপ্রস্থ হাসি। বয়স হলেও কাকু-কাকিমার চেহারা যেন সেই এক রয়ে গেছে। একটা দুঃসংবাদে মনটা খারাপ হয়ে গেল - মৌদিদির স্বামী অল্পদিন হল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। সেই মৌদিদি - পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে বলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান অভ্যাস করত - নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরাচরিত এই ছবিটাই আমার শিশুমনে আঁকা হয়ে রয়ে গিয়েছিল - তার কী পরিণতি! ফোনেই কথা হল উত্তম দাদার সঙ্গে, গেস্টহাউসের কাছেই উত্তমদাদাদের কোয়ার্টার - কাল রাতে নেমন্তন্ন। শুধু গৌতমদাদার সঙ্গেই দেখা হলো না। ছেলেবেলায় গৌতমদাদাই আমার প্রিয় ছিল সবথেকে কাকিমা বলল। সামনের মিষ্টির দোকান থেকে কাকিমাই নিয়ে এল চমৎকার ভেজিটেবল প্যাটিস আর একটুপরে মিষ্টির দোকানের লোকটা গরম গরম ছানার জিলিপি দিয়ে গেল। এই দোকানে দারুণ দই করে একথা শুনে আর প্যাটিস ও ছানার জিলিপির দারুণ স্বাদ পেয়ে রাণাদাদা গুটি গুটি মিষ্টির দোকানের দিকে এগোয়। আমিও উঠে পড়ি। রাণাদাদাদের বাড়িতেই দাদার ছোটবেলার এক বন্ধু অমিত আসবে। আর আমার ঘুম পাচ্ছে তেড়ে।

পরদিন ভোরে উঠে তৈরি হয়ে নিই। আজ অভিযান কল্যাণেশ্বরী, মাইথন। ছোটবেলায় প্রায় প্রতি শীতেই বাবা-মা-দাদার সঙ্গে একটা দিন কাটানোর স্মৃতি রয়েছে এই দুই জায়গা ঘিরে। রাণাদাদাদের বাড়ি থেকেই ব্রেকফাস্ট সেরে বাসে দেন্দুয়া। সেখান থেকে ট্রেকারে কল্যাণেশ্বরী। সেখানে অপেক্ষা করছিল কলেজের বন্ধু মানস। ওর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের একটি কলেজে হয়তো মাসদুয়েক পড়েছিলাম। কুড়ি বছর কেটে গেছে, রয়ে গেছে বন্ধুতা। মাঝে প্রায় দশবছর দেখা হয়নি তাই রানিগঞ্জ আর কলকাতার মাঝে সেতু বাঁধল আমার এই ভ্রমণ।

মন্দির চত্তরের সিঁড়ি দিয়ে নামি। দুপাশ থেকে ফুলওয়ালা আর চটিরাখাদের ডাকাডাকি। বলি, 'পুজো দেবনা, কী মুশকিল! পিছনের ঝরনাটায় যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে?' একটু আশ্চর্য হয়, হয়তো বিরক্তও, তারপর ওরাই পথ বাতলায়। আমার স্পন্ডাইলোসিসের কোমর আর মানসের পোলিওর পা আর ক্রাচ পিছল সিঁড়িতে সামলে সাবধানে নামি। ও বলে, 'বুঝলি, বয়স হয়েছে, এখন আর আগের মতো দৌড়াতে পারি না।' সত্যিই পারত কিন্তু আগে, কলেজের চারতলা-একতলা আমার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি তো বটেই। ঝরনার জায়গাটা অনেকটা বাঁধিয়ে দিয়েছে। ওপরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সিমেন্টের চত্তর। এখন আর যেকোনও দিক দিয়ে নেমে যাওয়া যায় না জল ছুঁতে। আর নামলাম না সিঁড়ি দিয়েও, এই বয়সে পড়েটড়ে গেলে সেটা কারোর পক্ষেই সুবিধাজনক হবে না। চড়চড়ে রোদ, কিন্তু ভারি ভালো লাগছিল আমার ছোটবেলার খুব প্রিয় এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে। এই ঝরনা, পাহাড়, জঙ্গল - মনে হয় যেন অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আছি - অচেনা কোনও ভ্রমণ কাহিনিতে।

কল্যাণেশ্বরী থেকে অটো ভাড়া করে মাইথনে পৌঁছলাম। প্রচণ্ড রোদ্দুর আর গরমে পর্যটক প্রায় নেই। তেমন ঠান্ডা-নয় আমুল কুল পান করে কুল হওয়ার একটা চেষ্টা করলাম দুজনে। তারপর ব্রিজ বরাবর পায়ে পায়ে এগোনো। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া রোদে বরাকর নদীর জল ঝিলমিল করে। মাঝে মাঝে জেগে থাকা নির্জন সবুজ দ্বীপ। সেতুর ওপর কিছুদূর হেঁটে ফিরে এসে বাগানের দিকে যাই। গাছপালার ছাওয়া দেখে পাথরে বসে আড্ডা মারি দুজনে। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা নেমে নদীর কোলের কাছে আসি। নদীর চড়া, রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে। আমরা একটু ওপরে ছায়ায় বসে থাকি চুপচাপ। কারা যেন নৌকা চেপে ভেসে যায় দ্বীপের দিকে। অটোর ড্রাইভার তাড়া মেরে যায়। বলি, 'যাচ্ছি যাচ্ছি', আসলে মুহূর্তগুলো কুড়িয়ে রাখছিলাম নিঃশব্দে। ভীষণ শান্ত নির্জন কয়েকটা মুহূর্ত প্রকৃতির সঙ্গে।

কল্যাণেশ্বরীতে ফিরে বাস ধরে আসানসোলে পৌঁছলাম। বাসস্ট্যান্ডেই জাইকা রেস্টুরেন্টে দুপুরের আহার সারা হল। স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে সদ্য কলেজে অধ্যাপনায় জয়েন করেছে মানস। অতএব খাওয়া তো আমার পাওনাই ছিল।

শরীর বেশ ক্লান্ত। ফেরার সময় চলে আসছে। হয়তোবা মনখারাপও খানিক। আসলে আবার আসব বলে ফেলাটা সহজ কিন্তু আসাটা সত্যিই ততোটা কি? রাত্রে উত্তমদাদাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন - বৌদির হাতের ফ্রায়েড রাইস মাংসে হাল্কা ডিনার! উত্তম দাদা সারা দিনের ধুলোয় মলিন চশমাটা পরিষ্কার করে দিল টেনে নিয়ে। গেস্টহাউস এসে নিয়ে গেল আর পৌঁছে দিয়ে গেল আমার নবলব্ধ ভাইপোটি।

কোন ট্রেনে ফিরব ঠিক করতে পারছিলাম না। সকাল আটটা নাগাদ রূপনারায়ণপুর স্টেশন থেকেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে বর্ধমান, সেখান থেকে লোকালে কলকাতা - এটাই ভেবেছিলাম গোড়াতে। ঘুম ভেঙে দেখি আমার চিরাচরিত গায়ে-ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। দুপুরবেলায় সেই সপ্তাহান্তিক নাঙ্গালড্যাম এক্সপ্রেসই সুবিধের হবে - তিনদিন আগে সে আমাকে আসানসোলে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল পাঞ্জাব, আজ আবার আমার মতই কলকাতা ফিরছে। ধীরেসুস্থে বেরোনো যাবে ঠিক। বিছানা ছেড়ে উঠতে আর ইচ্ছে করে না। দেবাশীষ এসে হাত লাগালো শেষে। আমাকে এবং ব্যাগটাকে টেনে নিয়ে আসানসোলের বাসে তুলে দিল।

.....

ফিরে আসার পর যতবার চশমা মুছি কেবল উত্তম দাদাকে মনে পড়ে। তেমন অন্যদেরও বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মুহূর্তে। কিছু পেলাম, কিছুবা রেখে এলাম এই ভ্রমণে। তারই একটুকরো এই লেখাও।

হয়তো এভাবেও ফিরে আসা যায়।

'আমাদের ছুটি' -র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত, বর্তমানে অন্য কোনও নামী- অনামী পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত নন। চাকরি বা ব্যবসা কোনটাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি, গৃহকর্মনিপুণাও নন। ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি লেখার পর এখন নিজের আনন্দে মেতে আছেন গবেষণায়। প্রাণীবিজ্ঞানের স্নাতক এবং ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পাঠান্তে বাংলায় ভ্রমণ সাহিত্যের চর্চা করছেন। এরপরে কী করবেন তা নিজেও জানেন না। তাঁর কথায় নিজের পরিচয় 'ঘরেও নাহি পারেও নাহি যে জন আছে মাঝখানে'। ২০১৫ সালের বইমেলায় 'পরশপাথর' প্রকাশনা থেকে তাঁর সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বাংলার অজপাড়া এক গাঁয়ে

রফিকুল ইসলাম সাগর

সকাল সোয়া দশটা। মহাখালী বাস টার্মিনাল এসে দশ মিনিটের জন্য বাস মিস করলাম। মাসুল গুণতে হল দেড় ঘন্টা। পরের বাস বেলা সাড়ে এগারটায়। ততক্ষণ টার্মিনালের ভেতরেই অপেক্ষা। সময় কাটল খুবই অস্থিরতায়। এর মধ্যে কতবার যে ওয়েটিং রুমের সিট থেকে উঠে বাসের টিকিট কাউন্টারের সামনে গিয়েছি তার হিসেব নেই। এগারটা বেজে কুড়ি মিনিট। একজন এসে বলল, 'সিলেট এগারটা ত্রিশের যাত্রীরা আমার সাথে আসেন'। ওঠার পর ঠিক সময়েই বাস ছাড়ল অবশ্য।

ভৈরব পর্যন্ত যানজটবিহীন আরামেই যাচ্ছিলাম। অনাকাঙ্ক্ষিত জ্যামের কারণে ভৈরব দূর্জয় মোড় থেকে ব্রিজ পার করতে দশ মিনিটের পথ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগে গেল। এবার বি-বাড়িয়া বিশ্বরোড পৌঁছলে বাস থেকে নেমে চার'শ টাকায় ভাড়া করা সিএনজি অটোরিক্সায় উঠলাম। আগামী গন্তব্য ফান্দাউক। প্রায় দশ মিনিটের পথ এগিয়ে সড়কের পাশেই বাঁদিকে একটি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্প চোখে পড়ল। অটোরিক্সা চালক জানালেন, এটা বাংলাদেশের ছ'টি বড় বিজিবি ক্যাম্পের একটি।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলা অটো সরাইল পেরিয়ে যাওয়ার সময় সড়কের দু'পাশে দেখতে পেলাম দূরদূরান্ত পর্যন্ত পানি আর পানি। থৈ থৈ পানির বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ট্রলার আর নৌকা। ডিঙি নৌকায় জেলেরা মাছ ধরছে। আশেপাশে ঘর-বাড়ি চোখে পড়ল না। প্রচণ্ড বাতাস। যাকে বলে প্রাণ জুড়োনো বাতাস। অটোরিক্সার প্লাস্টিকের বডিতে বাতাসের আঘাত করার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। চুলগুলো বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মুখটা একটু বাইরে বার করে বাতাসের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করলাম। আহ! এসব অনুভূতির জন্যই মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে যায় - কথাগুলো মনে এল। ততক্ষণে ফান্দাউক পৌঁছে গেছি। ভাড়া মিটিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম। খানিক এগোতে সামনেই বাঁশের সাঁকো। ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো পেরিয়ে আবার তার জন্য টোল পরিশোধ করতে হল জনপ্রতি পাঁচ টাকা! সাঁকোটির হাল দেখে মনে হল, টোলের টাকা সাঁকোটি মেরামতের কাজে ব্যবহার হয় না। এখানে টোল আদায় শুধুমাত্র ধান্দাবাজি। এ ব্যবসা অবশ্য আর বেশিদিন চলবেনা - পাশেই দেখতে পেলাম সেতু নির্মাণের কাজ অর্ধেকেরও বেশি হয়ে গেছে। শেষ হলে এই পথে সরাসরি বাস চলবে।

বিখ্যাত ফান্দাউক বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নজর পড়ল একটা মিষ্টির দোকানের ভিতরে। রসমালাই দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। বেশ ভিড়। ভেতরে বসার জায়গা পেলাম না। দাঁড়িয়েই একবাটি রস মালাই খেয়ে আরো দু কেজি প্যাকেটে দিতে বললাম। ঢাকার থেকে ঢের সস্তা। আরো দু'কেজি অন্য মিষ্টিও কিনে নিলাম। মিনিট পাঁচেক হেঁটে এবার ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সায় বামৈ পর্যন্ত গেলাম। পঁচিশ মিনিটের মতো সময় লাগল। এখনও অবশ্য কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাইনি।

সকাল সোয়া দশটা। মহাখালী বাস টার্মিনাল এসে দশ মিনিটের জন্য বাস মিস করলাম। মাসুল গুণতে হল দেড় ঘন্টা। পরের বাস বেলা সাড়ে এগারটায়। ততক্ষণ টার্মিনালের ভেতরেই অপেক্ষা। সময় কাটল খুবই অস্থিরতায়। এর মধ্যে কতবার যে ওয়েটিং রুমের সিট থেকে উঠে বাসের টিকিট কাউন্টারের সামনে গিয়েছি তার হিসেব নেই। এগারটা বেজে কুড়ি মিনিট। একজন এসে বলল, 'সিলেট এগারটা ত্রিশের যাত্রীরা আমার সাথে আসেন'। ওঠার পর ঠিক সময়েই বাস ছাড়ল অবশ্য।

ভৈরব পর্যন্ত যানজটবিহীন আরামেই যাচ্ছিলাম। অনাকাঙ্ক্ষিত জ্যামের কারণে ভৈরব দূর্জয় মোড় থেকে ব্রিজ পার করতে দশ মিনিটের পথ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগে গেল। এবার বি-বাড়িয়া বিশ্বরোড পৌঁছলে বাস থেকে নেমে চার'শ টাকায় ভাড়া করা সিএনজি অটোরিক্সায় উঠলাম। আগামী গন্তব্য ফান্দাউক। প্রায় দশ মিনিটের পথ এগিয়ে সড়কের পাশেই বাঁদিকে একটি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্প চোখে পড়ল। অটোরিক্সা চালক জানালেন, এটা বাংলাদেশের ছ'টি বড় বিজিবি ক্যাম্পের একটি।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলা অটো সরাইল পেরিয়ে যাওয়ার সময় সড়কের দু'পাশে দেখতে পেলাম দূরদূরান্ত পর্যন্ত পানি আর পানি। থৈ থৈ পানির বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ট্রলার আর নৌকা। ডিঙি নৌকায় জেলেরা মাছ ধরছে। আশেপাশে ঘর-বাড়ি চোখে পড়ল না। প্রচণ্ড বাতাস। যাকে বলে প্রাণ জুড়োনো বাতাস। অটোরিক্সার প্লাস্টিকের বডিতে বাতাসের আঘাত করার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। চুলগুলো বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মুখটা একটু বাইরে বার করে বাতাসের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করলাম। আহ! এসব অনুভূতির জন্যই মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে যায় - কথাগুলো মনে এল। ততক্ষণে ফান্দাউক পৌঁছে গেছি। ভাড়া মিটিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম। খানিক এগোতে সামনেই বাঁশের সাঁকো। ঝুঁকিপূর্ণ সাঁকো পেরিয়ে আবার তার জন্য টোল পরিশোধ করতে হল জনপ্রতি পাঁচ টাকা! সাঁকোটির হাল দেখে মনে হল, টোলের টাকা সাঁকোটি মেরামতের কাজে ব্যবহার হয় না। এখানে টোল আদায় শুধুমাত্র ধান্দাবাজি ব্যবসা। এ ব্যবসা অবশ্য আর বেশিদিন চলবেনা - পাশেই দেখতে পেলাম সেতু নির্মাণের কাজ অর্ধেকেরও বেশি হয়ে গেছে। শেষ হলে এই পথে সরাসরি বাস চলবে।

বিখ্যাত ফান্দাউক বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নজর পড়ল একটা মিষ্টির দোকানের ভিতরে। রসমালাই দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। বেশ ভিড়। ভেতরে বসার জায়গা পেলাম না। দাঁড়িয়েই একবাটি রস মালাই খেয়ে আরো দু কেজি প্যাকেটে দিতে বললাম। ঢাকার থেকে ঢের সস্তা। আরো দু'কেজি অন্য মিষ্টিও কিনে নিলাম। মিনিট পাঁচেক হেঁটে এবার ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সায় বামৈ পর্যন্ত গেলাম। পঁচিশ মিনিটের মতো সময় লাগল। এখনও অবশ্য কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাইনি।

"বাকিটা পথ যেতে হবে 'বামৈ নাউ ঘাট' থেকে ইঞ্জিন চালিত কাঠের নৌকায় চড়ে (নৌকার স্থানীয় নাম 'নাউ')। ঘাটে পাঁচ-ছ'টি নৌকা দেখতে পেলাম। দেখতে প্রায় একই রকমের সবকটা। আকারে খুব বড় না। ঘরের মতো চারদিক বন্ধ। ওপরে টিনের চাল। সামনে পিছনে দরজার মতো ফাঁকা দুটি প্রবেশ পথ। দু'পাশে তিন-চারটি জানালা। শিশু ও মহিলারা বসেছে ঘরের ভিতর। পুরুষরা টিনের চালের ওপর। অন্যদের মতো আমিও বসলাম চালের ওপরেই। একে একে সংখ্যায় আমার ধারণার বেশি যাত্রী উঠলো। তারপরেও মাঝি আরও যাত্রী নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। মাঝির সঙ্গে নৌকার হেলপার একটি শিশু। শিশুটি একটু পরপর উচ্চস্বরে ডাকছে, 'জিরু ন ন ন ন ন ন ন্ডা'। নৌকোটা টলমল করতে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম, যদি ডুবে যায় এই ভেবে। আর তখনই নৌকার মাঝি যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'নাউ গড়াইতাছে! সামনে পিছে মিল্লা বও'। আরো ক'জন যাত্রী উঠল নৌকায়। অতঃপর ঘাট থেকে একজন নাউ ছাড়ার নির্দেশ দিল। ইঞ্জিন স্টার্ট করে নাউ নিয়ে এগিয়ে চলল মাঝি। অধিক যাত্রীর ভারে নৌকা প্রায় ডোবে-ডোবে অবস্থা। আমার মনে আতঙ্ক! এমনভাবে যাতায়াত করা এখানের মানুষের কাছে হয়তো স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু আমি ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছিলাম না।

বেলা প্রায় শেষের দিকে। পশ্চিমের আকাশের একাংশে একটু আগুনের রঙের মতো লালচে দাগ। কেমন জানি একটা নিস্তব্ধতার মাঝে ব্যাঙের ডাক আর নৌকার ইঞ্জিন ঘোরার শব্দ। এর সঙ্গে সূর্যটা যেন ডুব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেমন জানি ঝিম-ম-ম অনুভূতির মাঝে হারালাম। সমস্ত শরীরে বাতাসের আঘাত গোটা দিনের সব ক্লান্তি তাড়িয়ে দিচ্ছিল। আলো তখনও পুরোপুরি অন্ধকারে হারায়নি। বিদ্যুতের ভোল্টেজ একেবারেই কম থাকলে একটা বাল্বের আলো যেমন স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায় ঠিক তেমনি সূর্যের আলোর নিভু নিভু ভাব। হঠাৎ সূর্যটা হারিয়ে গিয়ে চারিদিকে অন্ধকার নামিয়ে গেল। প্রতিদিন ঠিক একইভাবে সূর্য আসা-যাওয়া করে। পার্থক্য শুধু আগেরদিন সূর্যডুবির এ দৃশ্য দেখেছিলাম ঢাকার আকাশে। ঘড়ির কাঁটা সেকেন্ড তারপর মিনিট এভাবে এগোচ্ছে। এরই মাঝে সেই শিশুটি এসে ভাড়া চাইল, মাথাপিছু দশ টাকা। ততক্ষণে 'জিরুন্ডা' গ্রামের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি, আর হয়তো মিনিট দশ।

নৌকায় থাকা যাত্রীদের প্রস্তুতি দেখে বুঝতে বাকি রইল না, জিরুন্ডা এসে গেছি। আধঘন্টা কেটে গেছে এরমধ্যেই। ঘাটে পৌঁছাবার আগেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন মাঝি। চিকন মাপের বাঁশ হাতে নিয়ে এবার তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাঁশ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে নৌকা ঘাটে ভেড়ালেন। ভেবেছিলাম এখানেই নামতে হবে। মাহমুদ ভাই বললেন, এ ঘাটে নামব না। একজন মহিলা ও শিশুকে নামিয়ে আবার ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন মাঝি। দু'মিনিট পর একইভাবে আরেক ঘাটে ভেড়ানো হলো নৌকা। এখানেও নামল ক'জন। এভাবে চারটি ঘাট পর অবশেষে পৌঁছলাম জিরুন্ডা গ্রামে। লোকাল বাসে চড়েছি, লোকাল ট্রেনে চড়েছি, জীবনে এই প্রথম লোকাল নৌকায় চড়লাম। ঘাটে ঘাটে যাত্রী নামানো দেখার অভিজ্ঞতা প্রথম বলে হয়তো দারুণ মনে হল। যেই নৌকাটিতে করে এখানে এলাম এটি নাকি ছিল এ পথের লাস্ট ট্রিপ। সকাল পর্যন্ত আর কোনও নৌকা চলবে না। কোনও কারণবশত যদি কেউ বামৈ থেকে রওনা দিতে দেরি হয়ে যায় তাহলে জিরুন্ডা ফিরতে তার সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাতে ডাকাতির সম্ভাবনা আছে বলে নৌকা চলাচল বন্ধ থাকে। রাতযাপন করলাম এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে - পনেরদিন আগেও নাকি এটি পুরোপুরি পানিবন্দী ছিল। রাত পেরিয়ে সকাল বেলা গ্রামের পুরোপুরি রূপ ধরা দেয় আমার দৃষ্টিতে। যে রূপ রাতের আঁধারে ছিল অস্পষ্ট। আশপাশ ঘুরে দেখলাম এখনো অনেক বাড়ি পানির মাঝে উঁকি দিয়ে আছে।

জিরুন্ডা গ্রামের নাম অনেক পাঠকই সম্ভবত এর আগে কোনদিন শোনেননি। আমি এ গ্রামের নাম প্রথম শুনি বছর তিনেক আগে। সেই তখন একবার এসেছিলাম, মাঝে পাঁচ-ছয় মাস আগে আরেকবার। জিরুন্ডা নামক গ্রামটি হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত, লাখাই থানার অন্তর্ভুক্ত। জিরুন্ডা এবং তার আশেপাশের আরও কয়েকটি গ্রাম - মানপুর, সন্তোষপুর, কৃষ্ণপুর ও রাধানগর - এদের অজপাড়াগাঁ বলা চলে। গ্রামগুলোর বছরে দুই রূপ - জুলাই থেকে অক্টোবর বর্ষাকালীন একরূপ, আর বাকি মাসগুলোতে আবার অন্য রূপ। পূর্বে দু'বার যখন এসেছিলাম অনেকেই আমাকে বর্ষাকালে বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বর্ষাকালে নৌকা একেবারে ঘরের দরজার সামনে আসবে, এমন কথা বলেছিল কেউ কেউ। সব মিলিয়ে এবার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পেরেছিলাম। বামৈ থেকে যখন নৌকায় উঠলাম তখন আগের দেখা অনেক কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। না পারাটাই স্বাভাবিক। জোয়ারের পানিতে পথ-ঘাট, মাঠ, ধানের ফসল, খাল-বিল, ঝিল সব মিলে মিশে একাকার। নৌকায় কয়েকজন জানায়, এখন তবু জোয়ারের পানি নামতে শুরু করেছে। এবারের বন্যায় নাকি গত কয়েক বছরের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও দ্বিগুণ পানিতে ডুবেছিল। কিছু কিছু জায়গায় এখন পানি না থাকলেও, কিছুদিন আগেও নাকি পানিতে ডুবে ছিল, এমন কথাই বলাবলি করছিলেন গ্রামের ক'জন প্রবীণ।

জিরুন্ডাসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষরা যোগাযোগসহ আধুনিক অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না গ্রামে। বাজার আনতে যেতে হয় বামৈ নয়তো ফান্দাউক। সদরে বা রাজধানীতে যেতে হলে আগে যেতে হবে বামৈ। সেখান থেকে রাজধানী যাওয়ার বাস ছাড়ে দিনে দু'টি। তাও আবার লক্কর-ঝক্কর লোকাল বাস। গ্রামে পথচলার রাস্তা যতটুকু আছে তা না-থাকার মতোই। রিক্সায় চড়ে কিছুটা পথ যাওয়া গেলেও বেশ কয়েকবার যাত্রীকে নেমে হেঁটে সামনে গিয়ে আবার উঠতে হয়। হিসেব কষলে দেখা যায়, রিক্সায় বসে থাকার চেয়ে হেঁটেই বেশি পথ আসা হয়েছে। আর তাই দূরত্বের ব্যবধানটা অনেক বেশি হলেও, দীর্ঘ সময় লাগলেও প্রয়োজনে গ্রামের মানুষেরা পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেন। গোটা কয়েক গ্রাম মিলিয়ে রিক্সার সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা। বরং বর্ষাকালে পানিতে ডুবে

থাকলেও সব মিলিয়ে এখানকার মানুষজনের বর্ষাকালেই চলাচলে সুবিধা - নৌকাতে - যখন খাল-বিল-পথ-মাঠ-ক্ষেত সব মিলেমিশে একাকার।

ঘড়ির কাঁটায় বেলা এগারটা। জিরুন্ডা গাঁয়ের নাউ ঘাটে বসে নৌকায় ওঠার জন্য অপেক্ষা। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কিনতে বামৈ যেতে হবে। পনের মিনিট অপেক্ষা করে নৌকা পেলাম। গতরাতের মতো চালের ওপর উঠে বসলাম। রোদের তাপ একটু বেশিই মনে হল। পাশাপাশি একের পর এক ঘাট থেকে নৌকায় যাত্রী উঠছে। এই ঘুরপাকে কেটে গেল আধ ঘন্টার বেশি সময়। অথচ আধ কিলোমিটার পথও এগোতে পারিনি। এক পর্যায়ে খুব বিরক্ত লাগছিল। রোদের তাপ আরো বেশি মনে হচ্ছিল। কয়েকজন রোদ থেকে নিজেকে আড়াল করতে ছাতা মেলে ধরেছে মাথার ওপর। তাদেরকে এমন ঘাপটি মেরে বসে থাকতে দেখে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। দেখলাম, বুড়ো মাঝিটাও একটা ছাতা মেলল। আমাকে ডাকল, তার পাশে আসার জন্য। আমার হাতে ছাতাটি ধরিয়ে দিয়ে তিনি ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন - তারপর আমার পাশে বসলেন। থৈ থৈ পানির বুকে ভাসছে নৌকা। মাঝি একটা লোহার হ্যান্ডেলের মাধ্যমে নৌকাটিকে ডানে-বায়ে নিয়ন্ত্রণ করছে - আমি আমাদের দুজনের মাথায় ছাতা ধরে! বুড়ো মাঝি একটু পরপর একটা করে বিড়ি জ্বালিয়ে ফুঁকছে। কিছু বলতে পারলাম না, রোদে পোড়ার চেয়ে বিড়ির ধোঁয়া বেশি উত্তম বলে তখন মনে হল।

জোয়ারের পানিতে গ্রামের মানুষের মাছ ধরার দৃশ্য আমার কাছে এক প্রকারের উৎসবের মত লাগে যাকে বলা যেতে পারে সিজনাল মাছ ধরার উৎসব। নৌকায় বসে দেখলাম এখানে-সেখানে অনেকেই সিটকি জাল পেতে বসেছে। আবার কেউ কেউ উড়াইন্যা জাল ব্যবহারে মাছ ধরছে। এছাড়া নৌকা থেকে জাল ফেলে ও বর্শি পেতেও মাছ ধরতে অনেকে ব্যস্ত। দেখে মনে হল, মাছের চেয়ে মাছ ধরার মানুষের সংখ্যা বেশি। বামৈ ঘাটে পৌঁছাতে সময় লাগবে আর দু'তিন মিনিট। এ পথে অনেকগুলো মাছ ধরার জাল পাতা। আর তাই মাঝি খুব সতর্কভাবে নৌকা এগিয়ে নিচ্ছিল। ইঞ্জিন বন্ধ করে মাঝি এবার বাঁশ হাতে নিল। নৌকার ইঞ্জিনের পাখায় জাল আটকে গেলে ইঞ্জিন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নৌকা থেকে নেমে ঘাটে গতদিনের তুলনায় মানুষের আনাগোনা একেবারেই দেখলাম না।

আধঘন্টা পর আবার ঘাটে এসে সেই নৌকাটিতেই উঠলাম জিরুন্ডা যাওয়ার জন্য। যাত্রী সংখ্যা কম থাকলেও মাঝি আমাদের নিয়ে নৌকা ছাড়ল। একটু সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর একজন মহিলা যাত্রী মাঝিকে ভেতর থেকে বলল, নৌকা ঘাটে ভেড়াতে। এ ঘাট থেকে তার লোক উঠবে। নৌকা ঘাটে ভিড়লে মহিলাটি জোরে চিৎকার করল, আফা - আফা (আপা) বলে। চিৎকারে পাশেই একটি বাড়ি থেকে শিশু-কোলে বয়স্ক একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁর কথায় বোঝা যাচ্ছিল, তিনি এখন যাবেন না, পরে আসবেন। আমাদের সবাইকে নৌকায় অপেক্ষা করিয়ে দুই বোনের আলোচনা চলছে..। আমার খুব বিরক্তি লাগছিল। মাঝির মুখের দিক তাকিয়ে বুঝলাম উনিও বিরক্ত। তাদের দীর্ঘ আলাপচারি ফুরোলে নৌকা ছাড়ল। যাত্রী কম হলেও নামানোর সময় এক-এক ঘাটে এক-একজন করে নামছে। গতদিন যাত্রী বেশি থাকলেও এতগুলো স্টপেজ দেয়নি। আমি যে ঘাটে নামব সেটি এল একেবারে শেষে। নেমে কোমর টনটন করছে দেখে শরীরটা একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম।

জিরুন্ডা ফিরে দুপুরের খাওয়া শেষে বেড়াতে বেরোলাম। কাঁচা মাটির পথে হেঁটে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম আমার দিকে গ্রামের মানুষগুলোর কেমন জানি ভিন্ন দৃষ্টি। যেন বড় মাপের কোনো তারকা! মহিলারা বাড়ির উঠোনে আমাকে দেখতে ভিড় করেছে। লজ্জায় মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে উঁকি দিয়ে দেখছে। যেদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, সবাই আমাকে নিয়েই যেন কথা বলাবলি করছিল। গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোর এমন কাণ্ডে এক পর্যায়ে নিজেও লজ্জা পেতে শুরু করল। কয়েকপা এগিয়ে একসঙ্গে অসংখ্য গজারী গাছ দেখতে পেলাম। সেখান থেকে ভেসে আসছে পাখিদের জোরালো কিচির-মিচির। সামনে এগিয়ে দেখি গাছগুলোর ডালে ডালে দলে দলে চড়ুই পাখির ঝাঁক। মনে হল গোটা গাঁয়ের সব চড়ুই পাখি যেন এখানে জোট বেঁধেছে। কিচির-মিচির শব্দে কান ঝালাপালা করা অবস্থা। এরপর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে থামলাম জোয়ারের পানি পথ ছুঁই-ছুঁই। আরেকটু সামনে কদম ফেললে আমার পা ভিজে যায় পানিতে। তাকিয়ে দেখি, কচুরীপানার ভেলা ভেসে যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা-বক মাছ খুঁজছে, আবার কোনটি মাছ পেয়ে উড়াল দিয়ে চম্পট হচ্ছে। প্রকৃতির এমন দৃশ্য মন ভালো করে দেয় নিমেষেই। এসব কিছুর মাঝেই কাটালাম পাঁচদিন।

গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোকে ছেড়ে ব্যস্ত শহরে যখন ফিরব বিদায়বেলায় নিজের অজান্তেই চোখের কোণে জল এসেছিল।

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ফাউন্ডেশন কোর্সে পাঠরত রফিকুলের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়। পড়াশোনার পাশাপাশি বেড়ানো আর ভ্রমণ সাংবাদিকতা তাঁর পছন্দের বিষয়।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ণ রইল =

অলৌকিক রাতে কুয়াশাভেজা মৈনাম-লা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

~ মৈনাম-লা ট্রেকের আরও ছবি ~

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail" -Ralph Waldo Emerson

একটি বিপত্তি এবং...

যাত্রার শুরুতেই হোঁচট খেলাম। রাত ৮.৩০-এর কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস-এর এস-৭ কামরায় ওঠার সময়েই বিপদ। নীলাদ্রির রুকস্যাকের হাল্কা টোকায় আমার চারচোখের দুটো, অর্থাৎ আমার সাধের চশমা ট্রেনের তলায়। স্পেয়ার আনিনি। ট্রেন ছাড়তে মাত্র আধঘন্টা বাকি। আশেপাশে সবাই হা-হুতাশ করলেও সাহায্য কেউ করছে না। টর্চ জ্বেলে দেখা গেল মৃত্যু ঘটেনি তার, কিন্তু তিন-চারটে বড় বড় ইঁদুর ওটার ওপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। শেষমেষ আমার সবসময়ের লাইফ-সেভার নীলাদ্রির দ্বারস্থ হলাম। জুতো-মোজা খুলে পা নামিয়ে আঙুলের ফাঁকে গলিয়ে বেশ কায়দায় তুলে আনল জিনিসটা। কোনোমতে চশমাটা হস্তান্তর করেই বলল-"বাপরে কী বড়ো বড়ো ইঁদুর, আর-একটু হলে আমায় খেয়েই ফেলছিল"। ট্রেনের হর্ন বেজে ছাড়ার সাথে সাথেই মনে মনে "দুগগা দুগগা" বলে হাতজোড় করে পেন্নাম ঠুকলাম, যাত্রা শুরু।

যবনিকা উত্তোলন...

পদাতিকের এক গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার সুদীপের সামনেই বিয়ে। তার হবু ম্যাডাম আমাদের একরকম থ্রেট দিয়েই রেখেছিল যেন এই বছর ট্রেক-এর নামও না উচ্চারণ করে ও, তাহলে মার আমরা খাব! অগত্যা বড় কোনো ট্রেকের প্ল্যান পরিত্যাগ করে ছোট অথচ অফবিট কোনো কিছুর কথা ভাবা হচ্ছিল। ২০১৩-এর নর্থ সিকিম ট্যুরের সময়েই ভেবেছিলাম "মৈনাম-লা" ট্রেকের কথা। কিন্তু সেবার ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হওয়ায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এবার ভেবেই মনটা নেচে উঠল। একটু পড়াশোনা, একটু খবর জোগাড় এবং ইস্ট সিকিমের মনোরম শহর রাবংলায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হলিডে হোম বুকিং সেরে বেড়িয়ে পড়া গেল অক্টোবরের শেষ হপ্তায়। পদাতিক অপূর্ণই থেকে গেল সুদীপকে ছাড়া। মনখারাপকে সঙ্গে করে প্রিয় কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখ আবার নতুন করে দেখার পাগল নেশায় আমি, সৌনিপ আর নীলাদ্রি বেরিয়ে পড়লাম শিয়ালদা স্টেশনকে বিদায় জানিয়ে।

সূর্যোদয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা...

দুরন্ত গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে। হাল্কা ঠাণ্ডায় চাদর মুড়ি দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম। ট্রেন সবে কিষানগঞ্জ পেরিয়েছে, সৌনিপ বলল-"কাকারা (ওর পেটেন্ট সম্বোধন) জানলা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ... 'কাঞ্চা' (কাঞ্চনজঙ্ঘার আদুরে ভার্সন) মুখ বাড়িয়েছে...এখান থেকেই"। হুড়মুড় করে মিডল বার্থ থেকে নেমে জানালায় প্রায় চোখ ঠেকিয়ে দেখলাম...সত্যি, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে তাকে! আবছা কুয়াশায় আর আবছা কমলা-গোলাপি আলোয় ঢাকা, কিন্তু বেশ চেনা যায়। মন ভালো করা এক বুক আশা নিয়ে শিডিউলড টাইমের মাত্র আধঘন্টা পরে এনজেপি পৌঁছালাম। সব গাড়িওলারা পিঠে রুকস্যাক দেখে ধরে নিল আমরা গোয়েচালা ট্রেক করতে ইয়ুকসাম যাব। রাবংলা যেতে চাই শুনে কেউ রাজি হল না। একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বললেন -"আপনারা তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড চলে যান। ওখান থেকে বাস পেয়ে যাবেন"। তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডে এসে জানা গেল বাস ছাড়বে বটে, কিন্তু দুপুর একটায়। কী আর করা, বাধ্য হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র ট্যাক্সিটাকেই রিজার্ভ করতে হল। পকেট কাঁদলেও উপায় নেই। অগত্যা ভগবান ভরোসে - দীর্ঘ পথযাত্রা শুরু।

চার হিন্দু দেব ও এক 'অ্যাংরি বুদ্ধা'...

আমাদের ড্রাইভার দাদা বেশ খোশমেজাজি। আমরা মৈনাম ট্রেক-এ যাচ্ছি শুনে একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন ওটা একটু অফবিট আর নভেম্বরটা একেবারেই অফ সিজন। আমাদের যা গাড়িভাড়া ঠিক হয়েছিল, বললেন তার থেকে ৫০০ টাকা বেশি দিলেই আমাদের সাইড ট্যুর করিয়ে একেবারে হোটেলে পৌঁছে দেবেন। আমরাও রাজি হয়ে গেলাম। রাবং থেকে ২৫ কিমি মতো আগে নামচিতে একটা নতুন মন্দির কমপ্লেক্স আছে। চারধাম মন্দির। জন প্রতি পঞ্চাশ টাকার টিকিট। বিশাল জায়গা জুড়ে বদ্রীনাথ ধাম, দ্বারকানাথ ধাম, পুরীধাম এবং রামেশ্বরম এর মন্দিরগুলির রেপ্লিকা। তার মধ্যে দেবতারাও একই ভাবে অধিষ্ঠিত এবং পূজিত হয়ে চলেছেন প্রতিদিন। কিরাতবেশী মহাদেব যেন দ্বাররক্ষী হয়ে সবাইকে আগলে রেখেছেন। এক আঙ্গিনায় হিন্দু পুরাণের চার-চারটি বিশাল অধ্যায় সত্যিই দেখার এবং মন ভালো করে দেওয়ার মতো।
ওখান থেকে বেরিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের রেশ কাটতে না কাটতেই পৌঁছে গেলাম সমদ্রুপ্তসে মনাস্ট্রিতে। গেটে তিরিশ টাকা করে তিনটে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতেই লম্বা একফালি পিচরাস্তা স্বাগত জানাল, পাশে একটানা রঙিন প্রজাপতির মতো প্রেয়ার ফ্ল্যাগ সঙ্গে নিয়ে। মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় দেখা পাওয়া গেল তাঁর। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু (১২০ ফুট) গুরু রিমপোচে বা পদ্মসম্ভবের মূর্তি এই সমদ্রুপ্তসে-তেই। এই মূর্তি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে 'অ্যাংরি বুদ্ধা' নামে পরিচিত। সেই বিশালত্বের সামনে নিজেদেরকে বড়োই ক্ষুদ্র এবং দীন মনে হচ্ছিল। যথাসম্ভব পোজ দিয়ে একগাদা ছবি টবি তুলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ রাতের আশ্রয় রাবং-এ পৌঁছে গেলাম।

দুশমন দুঃসংবাদ...

পুরোনো দিনের হিন্দি ভূতের সিনেমার চৌকিদারদের মতো হনুমান টুপি আর কম্বলের চাদরমোড়া এক বাঙালি ভদ্রলোক আমাদের স্বাগত

জানালেন তাঁর হোটেলে। আমরা এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বুক করেছিলাম বলে সস্তাতেই পেয়েছিলাম। সারাদিনের ক্লান্তির পর ভালো ঘর পেয়ে মনটা খুশ হয়ে গেল। একটু ফ্রেশ হয়ে নীচে নামতে ভদ্রলোক বললেন আপনাদের মৈনাম ট্রেকের গাইড এসে গেছে, কথা বলে নিন। গাইডকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ। ক্লাস নাইনে পড়া সূরজ ও তার ক্লাসমেট নাকি আমাদের গাইড! বলল কমপক্ষে ২০০০ টাকা দিতে হবে এবং খাওয়ার খরচও। পাহাড়-জঙ্গলে ট্রেক সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আইডিয়া তাদের আছে বলে মনে হল না। আরোও বলল মৈনাম পিক-এ কেউ রাত্রিবাস করে না। রাত্রে থাকার কোনও জায়গা নাকি নেই। আমরা টেন্ট নিয়ে যাইনি। মহা বিপদেই পড়া গেল। সূরজ এও বলল যে একদিনেই উঠে নেমে আসা ছাড়া নাকি কোনও উপায় নেই। আর ওখান থেকে ভালেদুঙ্গা সানরাইজ পয়েন্টও যাওয়া যাবেনা। ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা কী করব ভেবে জানাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লাম।

মনটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। যে জন্য আসা সেটাই হবেনা! আমাদের পরেরদিন এই ট্রেক শুরু করার প্ল্যান ছিল। তাই হোটেল বুকিংও ছিল না। মালিক বেশি টাকা চেয়ে বসলেন ওই একই রুমের জন্য। অন্য বাঙালি হোটেল দেখতে গিয়ে নীলাদ্রি আর সৌনিপ মিরাকল করে ফেলল। হোটেল পাওয়া গেল। আর তার সঙ্গে পাওয়া গেল গাইড মনি গিরি-কেও। মাত্র ১৭০০ টাকায় সে রাত্রে থাকার জন্য রাজি হয়ে গেল। আমরা ঠিক করলাম একদিন অ্যাক্লেমাটাইজ করে পরের দিন রওনা দেব। বাকি সন্ধেটা আড্ডা মেরে, হাল্কা পথ পরিক্রমা করে, চিপস আর কফি খেতে খেতে টিভিতে আই.এস.এল-এর আটলাটিকো দি' কলকাতার খেলা দেখে কেটে গেল।

রাবংলার অভিষেক...

রাবংলার বুদ্ধ পার্কে

আমাদের গুগল কাকু সৌনিপ বেশ পড়াশোনা করেই এসেছিল আশেপাশে দেখার কী কী জায়গা আছে সেগুলো নিয়ে। কচুরি-তরকারি আর জিলিপি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারার পর ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে সাইড ট্যুর নিয়ে দরাদরি চলছিল। দামে পোষাচ্ছিল না বলে পিছিয়ে আসছিলাম বারবার। হঠাৎ একটা অল্টোর দিকে নজর গেল। ঝাঁ চকচকে। বেশ ফ্যাশনেবল এবং বড় বড় করে নাম লেখা "অভিষেক"। আমরা হাসাহাসি করছিলাম। নীলাদ্রি বলল, "ওই দ্যাখ তোর নিজের টাক্সি থাকতেও আমাদের নিয়ে যাচ্ছিস না"? তখন গাড়ির মালিক মূর্তিমান অভিষেক সামনে হাজির। সত্যিই অন্যদের ভাড়া কম চাইতে রাজি হয়ে গেলাম। প্রথম গন্তব্য "টেমি টি গার্ডেন"। ওখানে পৌঁছে কয়েকটা ছবি তুলেই আবার হই হই করে ছোটা হল "বুদ্ধ পার্কের দিকে"। ঠিক হল আগে "বুদ্ধ পার্ক"-কে ফেলে রেখে "রালং মনাস্ট্রি" যাব। ফেরার পথে ওখানে ঢোকা হবে।

রালং-এ পৌঁছে মনটা কেমন শান্ত হয়ে গেল। মূল শহর থেকে ৭ কিমি দূরে এই মনাস্ট্রি। বলা হয় তিব্বতি বৌদ্ধদের 'কাগয়্যু সম্প্রদায়' এই মনাস্ট্রি তৈরি করান পনেরোশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এই মঠ প্রাচীন বৌদ্ধ চিত্রকলা এবং থাংকার জন্য বিখ্যাত। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এখানে "পাং লাবসল" নামে একটি উৎসবে কাঞ্চনজঙ্ঘার পুজো করা হয়। আমরা মূল প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে হতবাক হয়ে প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন দেখলাম। এতই মনমুগ্ধকর সেই চিত্রকলা যে ছবি তোলার কথা কারো মনেও রইল না।

রালং মনাস্ট্রিতে কিশোর লামারা

বাইরে বেরিয়ে দেখি আকাশ কালো করে এসেছে। নীল-ছাই আর কালচে আকাশের প্রেক্ষাপটে একঝাঁক লালচে-মেরুন জোব্বা পরা তরুণ লামা পাঁচিলের উপরে বসে। অসাধারণ দৃশ্য। আমাদের বন্ধু ড্রাইভার অভিষেক হাঁক দিল। রওনা দিলাম বুদ্ধ পার্কের দিকে। বুদ্ধ পার্কের আর-এক নাম "তথাগত সাল (Tathagata Tsal)"। ২০০৬ সালে এই পার্ক বানানোর কাজ শুরু করে সিকিম সরকার। ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ গৌতম বুদ্ধের ২৫৫০-তম আবির্ভাব দিবসের দিন দলাই লামা এর শুভ উদ্বোধন করেন। পার্কের মূল আকর্ষণ ১৩০ ফুট উঁচু গৌতম বুদ্ধের ধ্যানী মূর্তি। অসাধারণ এই পার্কের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। ছবি তুলে আশ মিটছিল না। কিন্তু পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছিল আর আকাশের অবস্থাও ভালো ঠেকছিল না। অগত্যা হোটেলে ফিরে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ। বিকেল বেলা বেরোনো হল হাঁটতে। পাশের কিউরিয়ো শপ থেকে টুকিটাকি জিনিস আর মৈনাম-লা এর ভগ্ন মনাস্ট্রিতে জ্বালানোর জন্য ধূপ আর প্রেয়ার ফ্ল্যাগ কিনে হোটেলে ফিরলাম। দূরে মৈনাম-লা দেখা যাচ্ছিল। কুয়াশা আর মেঘে মাখামাখি হয়ে থাকা গহীন বনের ওপর একটু ফাঁকা জায়গা। বাকিদের মনে কী হচ্ছিল জানি না, আমি মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম। ওই জনমানবহীন জঙ্গলে এই বীভৎস ঠাণ্ডায় আমরা কি রাত্রিবাস করতে পারব!

মন রে...নাহয় পকেটে খুচরো পাথর রাখলাম...

উত্তেজনায় রাতে ঘুম হয়নি কারোরই। সকালে উঠে দরকারি কাজকর্ম সেরে লাঞ্চ প্যাক করে তৈরি হয়ে গেলাম আটটার মধ্যেই। আধ ঘন্টার মধ্যে গাইড মণি গিরি-কে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। একশো টাকার বিনিময়ে সে আমাদের পৌঁছে দেবে মৈনাম স্যাংচুয়ারির গেট পর্যন্ত। মিনিট দশেকে পৌঁছে গেলাম। ভিতরে ঢুকেই পিকচার পোস্টকার্ডের মতো ছোট্ট সাদা রঙের বন দফতরের অফিস চোখে পড়ল। তিন জনের ট্রেক ফি এবং ক্যামেরা ফি মিলে দিতে হল ২১০ টাকা। রাতে থাকব বলে টেন্টের চার্জ আরো একশো টাকা (দুটো টেন্টের জন্য)। আমাদের টেন্ট ছিল না, তাও মিথ্যে বলতে হল। নইলে থাকার অনুমতি মিলত না। ঘড়ি দেখে সকাল পৌনে ন'টায় পা বাড়ালাম গভীর জঙ্গলের উদ্দেশ্যে।

"মৈনাম" কথার আক্ষরিক অর্থ "ভেষজ উদ্ভিদের গুপ্তধন"। এই বিশাল ৩৫ বর্গ কিলোমিটারের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলকে স্যাংচুয়ারির মর্যাদা দেওয়া হয় ১৯৮৭ সালে। এই স্যাংচুয়ারিতে বিভিন্ন ধরনের আয়ুর্বেদিক বনৌষধির ভান্ডার মজুত আছে। পাহাড়ি চিতা, ভালুক, রেড পান্ডা, হরিণসহ বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর এবং হিমালয়ান ফেজ্যান্টের বসবাসস্থল এই পাহাড়। বর্ষাকালে ভীষণ জোঁকের উৎপাত থাকে এই জঙ্গলে। মৈনাম শীর্ষ স্যাংচুয়ারির গেট থেকে প্রায় ১৩ কিমি পথ। আধঘন্টাটাক এগোনোর পরেই পায়ে চলা রাস্তা প্রায় উধাও হয়ে গেল। মনি বলল আরও মোটামুটি ৫-৬ কিমি হেসেখেলে মোবাইলের টাওয়ার থাকবে। ও আমাদের সামনের একটা রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসতে বলল, আর নিজে জঙ্গলের মধ্যেকার এক সুতীব্র বিপদসংকুল শর্টকার্ট চড়াই বেছে নিয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা একেবারেই ভালো না লাগলেও আমাদের কিছু বলার সুযোগই ছিল না। অগত্যা ওর বলা প্রায় না বোঝা যাওয়া কাঁটাভরা জঙ্গুলে পথে এগোতে লাগলাম। কাল রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলে শোনা চন্দ্রবিন্দুর গানের একটা লাইন মাথায় ঘুরছিল -"মন রে...নাহয় পকেটে খুচরো পাথর রাখলাম..."।

ট্রেক শুরু

প্রাচীন জঙ্গল পেরিয়ে

জোঁকে-জঙ্গলে...

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেছিল। ঘন গভীর সদ্য কুয়াশা ভেজা স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলের বুনো গন্ধ নাকে টেনে এগিয়ে চলেছি কাঁটা ঝোপের দুর্নিবার আলিঙ্গন উপেক্ষা করে। মাঝে মাঝে ছবি তোলা, ভিডিও তোলা আর জল-চকোলেট খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু করে বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছিলাম আমরা। মনি গিরির টিকিটিও দেখা যাচ্ছেনা। একটা সময় নিশ্চিত মনে হতে লাগল আমরা পথ হারিয়েছি। মোবাইলের টাওয়ারে একটা মাত্র দাগ আসছে যাচ্ছে। ফোনে পাওয়া গেল ওকে অনেক চেষ্টার পর। যা হয় হোক ভেবে এগিয়ে যেতে যেতে ওর নাম ধরে পালা করে জোরে চিৎকার করতে থাকলাম। হঠাৎ নীলাদ্রি কাঁধ খামচে দাঁড় করাল। আমার বাঁ হাতের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছেন যিনি তাঁর অস্তিত্ব মোটেই টের পাইনি। মৈনাম পাহাড়ের কুখ্যাত রক্তচোষা জোঁক বাবাজি। কে জানে বাবা আরও কত ভিতরে ঢুকে আছে এই ভাবতে ভাবতে কিছুটা এগোতেই মনি বাবুর দেখা মিলল।

হারাধনের চারটি ছেলে, রইল বাকি দুই...

মনি নেপালি ছাড়া বোঝে না ভালো। হিন্দির অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা ওকে অনেক কষ্টে বোঝাতে পারলাম যে আমরা চাই ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুক। কিছুটা রাস্তা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল। কিন্তু কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কিছুক্ষণ বাদেই জঙ্গলের ভিতর আবার হারিয়ে গেল। একটা এমন জায়গায় তিনজনে এসে পৌঁছলাম যেখানে দুটো শর্টকাট ছিল। কোনটায় যাওয়া উচিত ঠিক করতে না পেরে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেলাম। ঠিক হল সৌনিপ একটা রুট স্কাউট করবে আরেকটা আমি আর নীলাদ্রি। মিনিট পনেরোর মধ্যে রাস্তা খুঁজে না পাওয়া গেলে আবার এখানেই দেখা করব। আইডিয়াটা বিপজ্জনক হলেও কিছু করার ছিল না। কিছুটা চড়াই পেরোতেই একটা পাথর বিছানো চওড়া রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে সৌনিপের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু ওর আর পাত্তা নেই। মিনিট কুড়ি হয়ে গেল। ফোনেও ওকে ধরতে পারছিলাম না। টাওয়ারই ছিল না। নীলাদ্রিকে বললাম তুই এখানেই থাক আমি এগিয়ে দেখি। রুকস্যাকটা নামিয়ে একটু এগোতেই দেখলাম একটা গাছ গোড়া থেকে ভেঙে রাস্তার উপর পড়ে আছে। সৌনিপের নাম ধরে জোরে চিৎকার করতে করতে এগোতে থাকলাম। খানিকটা এগোতেই সাড়া পাওয়া গেলো। ও ভেবেছিল রাস্তা শেষ ভেবে আমরা পুরোনো জায়গায় ফিরে গেছি। হারাধনের এক ছেলেকে তো পাওয়া গেল। আর-একজন কই? সৌনিপের কাছে ফিরতে দেখি মনিবাবু বসে গল্প জুড়েছেন। আর কতক্ষণ বাকি জিজ্ঞেস করতে বলল-"জি আভি ভি এক ঘন্টা লাগেগা"। খিদেয় পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। ঠিক হল রাতের আশ্রয়ে পৌঁছেই খাওয়া হবে।

রহস্যময় ভগ্নস্তূপ এবং পৈশাচিক বুদ্ধ...

টানা ছ'ঘন্টা হাঁটার পর আকাশ যখন মেঘে ঢাকতে শুরু করেছে, দু-চার ফোঁটা বরফ ঠাণ্ডা জলের টুকরো মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে, দূরে দেখতে পেলাম আমাদের রাত্রিবাসের আস্তানাটাকে। সাদা রঙের একটা ভেঙে পড়া একতলা সিমেন্টের ঘর। যার গায়ে অজস্র কাঠ পোড়ার দাগ। একটু ভয়ই পেলাম। এই মারাত্মক ঠাণ্ডায় এই জানালা-দরজা ভাঙা পাহাড়ের ঢালে নুয়ে পড়া বাড়িটায় সারারাত কাটাতে হবে? আমরা ভেবেছিলাম মৈনাম পিক-এ অবস্থিত ভগ্ন মনাস্ট্রিতে রাত কাটাব। ইন্টারনেটে পড়া ব্লগে ডিটেলিং-এর অভাব অজানা বিপদের আশঙ্কা এনে দিল। কেন টেন্ট আনলাম না এইসব ভাবতে ভাবতে ঘরটায় ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকে অনেকটা ভালো লাগল। মেঝেয় খড় এর ওপর টিন পাতা। তাতে একটা ম্যাট্রেসও পাতা আছে। আমাদের নিজেদের ম্যাট্রেসগুলো পেতে স্যাকগুলো নামিয়ে রাখলাম। মনি গেল কাঠ জোগাড় করতে। বিকেল হয়ে আসছে, ঠাণ্ডাও বাড়ছে। ৫-৬° সেলসিয়াস মতো হবে। খুব খিদে পাচ্ছিল। হোটেল থেকে বানিয়ে আনা রুটি তরকারি এক থালাতেই খেতে শুরু করলাম। একটু পর দেখি মনি হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বলল-"আপলোগ ভাই হেঁ ক্যা?" আমরা বললাম "নেহি, হম দোস্ত হেঁ"। অবিশ্বাসী চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের বলল-"আপ লোগো মে বহুত প্রেম হ্যায়, এক থালি সে খা রহে হো"। এই অযাচিত কমপ্লিমেন্ট পেয়ে আমরা হাসতে শুরু করলাম।

খাওয়ার পর আমরা ভাঙা মনাস্ট্রির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। এবার আর মনি আমাদের সঙ্গে এল না, জিনিসপত্র পাহারা দেওয়া আর আগুন

জ্বালানোর জন্য থেকে গেল। ঘন্টাখানেকের তীব্র চড়াই পেরিয়ে যখন মনাস্ট্রির সামনে গিয়ে পড়লাম দিনের আলো কমে এসেছে। সামনে গিয়ে গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। কেউ কোথাও নেই। একদম পাহাড়ের মাথায়। ঠিক পায়ের নীচে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। দরজায় তালা নেই। হাতল টেনে খুলতেই একঝাঁক অন্ধকার গ্রাস করে নিল। টর্চ আনিনি। ভিতরে ঢুকে চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল। সামনে সোনালি অ্যাংরি বুদ্ধা গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি। হাতে স্বর্ণাভদণ্ডে গাঁথা নরমুন্ড। মুখে এক পৈশাচিক অভিব্যক্তি। সত্যি ভয় পাওয়ানোর মতো। সামনে থাকা দেশলাই দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আলো খুব কমে এসেছে। ঝটপট কয়েকটা গ্রুপ ফোটো তুলে দ্রুত নামতে শুরু করলাম। সন্ধে হয়ে আসছে। মেঘ আর কুয়াশা জড়াজড়ি করে আস্তে আস্তে কনিফারের বড়ো বড়ো গাছগুলোকেও ঢেকে ফেলছে। ভাল্লুকের পাল্লায় যাতে না পড়তে হয় তাই জোরে জোরে কথা বলতে

সন্ধে নামার একটু আগে মৈনাম-লা শীর্ষে

বলতে নামতে লাগলাম। মনে মনে একটাই কথা ঘুরছিল। এই ঠাণ্ডায় যেন বৃষ্টিতে না ভিজতে হয়।

ভগ্ন মনাস্ট্রির অভ্যন্তরে গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...

আগুনের ধোঁয়া দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। আমরাও ফেরার সময় যতটা পারলাম কাঠ নিয়ে এলাম সঙ্গে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। সারাদিন ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। প্রায় ১৮ কিমি হেঁটে ফেলেছিলাম সারাদিনে। শরীরটা হঠাৎ করে বেশ খারাপ লাগতে লাগল। বুঝতে পারছিলাম অ্যাসিডিটি হয়ে গেছে। বমি পাচ্ছিল। সঙ্গে ওষুধ ছিলই। স্লিপিং ব্যাগটা পাতারও শক্তি ছিল না। সৌনিপ আর নীলাদ্রি পেতে দিল। আসলে আমাদের জল খুব কম খাওয়া হয়েছিল। মনি বাবু নিজের লাগেজ ছাড়া কিছু বইতে রাজি হননি। তিনজনে ছ'লিটারের বেশি জল ক্যারি করতে পারিনি। তার মধ্যেও ও ভাগ বসিয়েছিল। মৈনাম পাহাড়ে জলের কোনো সোর্স নেই। ছ'লিটার জলে চারজনের দু'দিন চালানো ভীষণ মুস্কিল। নিজেকে বলতে থাকলাম চুপ করে ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকি ঠিক হয়ে যাবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপছিলাম। স্লিপিং ব্যাগের ভিতরটা গরমই হতে চাইছিলনা। মনি ঘরের মধ্যেও একটা আগুন জ্বেলে দিল। উষ্ণতার চেয়ে ধোঁয়াই হচ্ছিল বেশি। হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গায়ে হাল্কা টোকা খেয়ে তন্দ্রা ভাঙল। "কাকা জেগে আছিস? শরীর ঠিক লাগলে একবার বাইরে চল"।

শরীর অনেকটা সুস্থ লাগছিল। জুতোটা গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি আগুন নিভু নিভু। একটা গনগনে লাল আভা বেরিয়ে আসছে শুধু। চারিদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শুক্লা দ্বাদশীর প্রায় পূর্ণ জ্যোৎস্নায় এক অপূর্ব মায়াময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্ডিম, কুম্ভকর্ণ এবং আরও কিছু চিনতে না পারা শৃঙ্গ। অলৌকিক সেই দৃশ্য এই পার্থিব জগতের থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেল আমাদের। প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে এই অলৌকিক দৃশ্যের অভিনয় হয়ে চলেছে এই প্রত্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে। আর এই সময়, এই কুয়াশার চাদর গায়ে মেখে, হাত পা অসাড় করা ঠাণ্ডায় এই গভীর জঙ্গলে সেই অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুভূতি বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। কিছুতেই সেই দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করা গেল না। অত ভালো ক্যামেরা আমাদের ছিল না। তাই মনের ক্যামেরাতেই সারাজীবনের মত ধরে রাখলাম। এই পান্ডববর্জিত পাহাড়শীর্ষে রাত কাটানোটা ভীষণ সার্থক মনে হল।

রাতের সেই আস্তানার সামনে আমরা চারমূর্তি

ভোরের ভালেদুঙ্গা...

ভোর পৌনে পাঁচটায় ঘুম ভাঙল। অবশ্য বলা ভালো আর শুয়ে থাকা গেল না। আমার জীবনে কাটানো সবথেকে কষ্টকর রাতের একটা ছিল ওই রাতটা। পাশ ফিরলেই ঠাণ্ডা ভিজে স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালটায় হাত ঠেকে যাচ্ছিল। আগুন নিভে গিয়ে ধোঁয়ায় ভরে গেছিল ঘরটা। একটা বরফ-শীতল ছুরির মতো হাওয়া স্লিপিং ব্যাগের ভিতরেও কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। যেদিকে ফিরে শুই উল্টোদিক জমে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যায়। ভোরের ফিকে আলোয় যেন প্রকৃতি অন্যরকম মমতায় আমাদের ডাক দিল। কাল রাতে রুপো-গলা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেছি। আজ ভোরের আলোয় সোনায় মোড়া দেখতে হবে। ঠিক পাঁচটা বেজে দশ মিনিটে প্রায় ১.৫ কিমি দূরের ভালেদুঙ্গা টপ-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ওখানে পুজো দিলে মনকামনা পূর্ণ হয়। আমরাও পুজোর জন্য ধূপকাঠি আর প্রেয়ার ফ্ল্যাগ নিয়ে নিলাম। দেখি মনি তার ভোজালিটা কোমরে গুঁজছে। কী হবে এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করায় বলল-"জি সুবহ কো না ভালু নিকলতা হে খানা ঢুঁডনে। ভালু আয়া তো কাট দেগা"। মনির ওই পাঁচ ফুটের রোগা শরীরে কী করে 'ভালু কো কাটেগা' ভাবতে ভাবতে এগোতে থাকলাম।

সূর্যের প্রথম কিরণে রাঙা পান্ডিম, কুম্ভকর্ণ ও কাঞ্চনজঙ্ঘা, - ভালেদুঙ্গা টপ থেকে

সকালের "ফ্রেশ লেগস" এর জোরে পৌনে ছ'টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম ভালেদুঙ্গা টপ-এ। দূরে মেঘের ফাঁকে ভোরের সূর্য সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে। উল্টোদিকে গোলাপি আভা লাগছে কাঞ্চা'র গায়ে। ঠিক লাজে রাঙা নতুন বউয়ের মতো। ধীরে ধীরে সূর্যদেব তাঁর প্রকাশ ছড়াতে শুরু করলেন। সোনা-গলা রোদ্দুর মেখে আমাদের দিকে তাকিয়ে ঝকঝকে অভিবাদন জানাল কাঞ্চা ও তার সঙ্গীরা। ধূপ জ্বালিয়ে আর ঘন্টা নাড়িয়ে পুজো সম্পন্ন করলাম নিজেরাই। প্রেয়ার ফ্ল্যাগও বাঁধা হল। পাহাড় চূড়ার বাধাহীন অনাবিল হাওয়া আমাদের হয়ে ওর মধ্যে লিখে রাখা মন্ত্র ছড়িয়ে দিল দশ দিকে। এবার ফেরার পালা। মনি আগেই ফিরে গিয়েছিল জিনিসপত্র গোছাতে। কয়েকটা গ্রুপ ফোটো তুললাম ক্যামেরায় স্ট্যান্ড লাগিয়ে। তারপর নামতে লাগলাম কাঁচামিঠে রোদ গায়ে মেখে।

বেগুনি অর্কিড...

সোনায় মোড়া শৃঙ্গরাজি দেখে মন ভরে গিয়েছিল। কালকের রাতের যত কষ্ট-অস্বস্তি দূর হয়ে গিয়ে নতুন উৎসাহ নিয়ে নামতে লাগলাম। উতরাই-এর পথে চলা অনেক কম কষ্টের এবং সাবলীল। সকালবেলার কাঁচা সবুজের গন্ধ নাকে নিয়ে অনেকটা পথ নেমে এসে একটা বানানো শেড-এর নীচে আশ্রয় নিলাম। মণি ততক্ষণে পগার পার। ওর নাকি আর-একটা বুকিং আছে। নীলাদ্রির অনেকক্ষণ ধরে শরীরটা খারাপ লাগছিল। তিনজনে বসে রেস্ট নিলাম কিছুক্ষণ। উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল কেমন। অদ্ভুত একটা গন্ধ বেশ কিছুক্ষণ ধরেই পাচ্ছিলাম। ভালো করে তাকাতেই দেখা গেল তাকে। বেগুনি রঙের অর্কিড। বড়ো কয়েকটা কনিফারের গায়ে ভর্তি হয়ে ফুটে আছে ফুলগুলো। একটু সময় লাগল ধাতস্থ হতে। জল খেয়ে আবার হাঁটা দিলাম। ট্রেক শেষ করে যখন ফরেস্ট গেটে পৌঁছালাম তখন বাজে সাড়ে এগারোটা। আসার সময় ভেবেছিলাম এবারের ট্রেকটা বড়োই ছোট আর নিরামিষ। হেলাফেলা করেছিলাম হয়তো কিছুটা। হিমালয় আমাদের ভুল ভেঙে দিল। তার কোনো সন্তানই যে প্রতিভাহীন এবং কম অহংকারী নয় সেটা বুঝতে পারলাম। দু'দিনের প্রায় ৩৬ কিলোমিটার চড়াই উৎরাই বৃথা যায়নি। মনের মণিকোঠায় আলাদাই জায়গা করে নিল সে।

ফেরা তবু ফেরা নয়...

সিকিমের মন-কেমন গন্ধ, মন রঙিন করে দেওয়া প্রেয়ার ফ্ল্যাগ, সবুজের হাতছানি আর বুদ্ধের চরণ ছেড়ে তিস্তাকে পাশে রেখে কলকাতা ফেরার পালা এসে গেল। ট্রেক পরবর্তী দিন রাবং-এ কাটিয়ে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছালাম তারও পরদিন। রাতের দার্জিলিং মেল-এ একজন সুন্দরী ডক্টর-এর সঙ্গে গল্প আর অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে করতে ভোরবেলায় পৌঁছে গেলাম শিয়ালদা স্টেশনে। ফিরলাম বটে কিন্তু পরবর্তী ট্রেকের প্ল্যানটাও ছকা হয়ে রইল। পদাতিকের নতুন অ্যাডভেঞ্চার, এবার লক্ষ্য উত্তরাখণ্ড।

~ মৈনাম-লা ট্রেকের আরও ছবি ~

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় মুখ্যালয়ে জুনিয়ার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেমিক্যাল) পদে কর্মরত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রসায়নে স্নাতক এবং এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড সয়েল সায়েন্স-এ স্নাতোকোত্তর । কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন। পাহাড় পাগল, হিমালয় প্রেমী। "পদাতিক" নামক চার জনের ছোট্ট ট্রেকিং দলের সদস্য। "বছরে একটা ট্রেক-এ না গেলে বছরটাই মাটি" তত্ত্বে বিশ্বাসী। ভ্রমনকাহিনি ছাড়াও কবিতা লেখা ও পড়া নেশা। অল্প-বিস্তর ছবি আঁকা আর ছবি তোলা প্যাশন।

কাশ্মীরের পথে পথে

শুভ্রা মিত্র

~ কাশ্মীরের তথ্য ~ কাশ্মীরের আরও ছবি ~ লাদাখের আরও ছবি

গত প্রায় সাত আট মাস ধরে যে সব জায়গার আরাধনা করে এসেছি, সেখানে পড়ল বাঁধা। যে মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে, এক লহমায় তার মায়া কাটিয়ে কী করে আর এক নতুন পরিকল্পনা শুরু হয়! অগত্যা... মন খারাপ। এ যেন অঙ্কের পরীক্ষা। সিলি মিসটেকের জন্য কম নম্বর পেয়ে পরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি। কিন্তু আগের পরীক্ষার কথাই বারে বারে মনে পরে। মন খারাপ হয়। কিন্তু তখন কি জানি পরের পরীক্ষাতে ১০০ তে ১০০ নম্বর মিলবে ? একেই বলে ভবিতব্য। যাওয়ার আর এক সপ্তাহ বাকি। মনে জোর টেনে ল্যাপটপটাকে প্রায় সবসময়েই কোলে কাঁখে নিয়ে ঘোরা শুরু হল। হয়ে গেল বুকিং দিল্লি থেকে শ্রীনগর। নাহ্...বাসে যাবার সৌভাগ্য হল না। সময় কম। অগত্যা.., দু'দিনের যাত্রা দু'ঘণ্টায় সেরে নিতে হল। চটপট হয়ে গেল শ্রীনগর হাউস বোট বুকিং। পাহলগাম গেস্ট হাউস, কারগিল এবং সর্বশেষে... লে। গাড়িও বুকিং হয়ে গেল শ্রীনগর, পাহলগাম এবং লেহ্ যাওয়া অব্দি - এ সবই ট্রিপ অ্যাডভাইসারের দৌলতে। চল, লেটস্ গো... যা থাকে কপালে।

শ্রীনগর। প্লেনের জানলা দিয়ে তুষারে ঢাকা পিরপাঞ্জাল রেঞ্জ-এর অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে শ্রীনগর এয়ারপোর্টে নামলাম। বেরোনোর আগে সবাইকে নিজের সম্বন্ধে যাবতীয় খুঁটিনাটি লিখতে হল। অবাক হলাম, নিজের দেশের ভেতরে যেন আর এক নতুন দেশ! পরে অবশ্য লাদাখের বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে, পাক ও চিন সীমান্তের দৌলতে। আমাদের হাউস বোটের মালিক আবদুল দুনো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাইরে। পথে যেতে যেতে নজরে এল বোরখা পরা মহিলাদের। সব সাইনবোর্ড উর্দুতে এবং কিছু ইংরেজিতে লেখা। স্থানীয় লোকেরা কাশ্মীরি ভাষায় কথা বলেন। এবারে গঙ্গার ঘাটে এলাম নৌকোয় উঠব বলে...থুড়ি...নাগিন লেকের ধারে গাড়ি থামল। শিকারা রেডি - আমাদের তোলার জন্য। কেমন সরু ছিপ ছিপে চেহারা। মন সংশয়ে দুলল। ডুবে যাবে নাতো! মোট ছ'জন লোক, তার মধ্যে আমি ডাবল! বাক্স-প্যাঁটরা প্রায় আশি-নব্বই কিলো। এত সব নিয়ে আমাদের সুপারস্মার্ট শিকারা চলল হাউস বোটের দিকে। দারুণ সুন্দর এই নৌকো-বাড়ি। পরিষ্কার পরিছন্ন। রয়েছে গরম জলের ব্যবস্থা। চটপট লাঞ্চ সেরে বারান্দায় এসে বসলাম - অভাবনীয়! উইলো, পপলার এবং পাহাড়ে ঘেরা নাগিন লেক অপেক্ষাকৃত বেশ শান্ত, পরিস্কার - ডাল লেকের তুলনায়। আমরা ঠিক করলাম শিকারা করে ডাল লেকে যাব। প্রায় চার ঘন্টার যাতায়াত। এখানে একটা কথা বলে রাখি। ডাল লেকে বাহারি শিকারা চড়ার আনন্দ আছে। কিন্তু শ্রীনগরে জলের মধ্যে যে জীবন গড়ে উঠেছে, তার একটি গভীর ছোঁয়া পেতে হলে এই দীর্ঘ জলভ্রমণের প্রয়োজন। ভেসে যেতে যেতে ভাসমান বাজার, সবজি বাগান আর কুরানের স্কুল দেখলাম। ছাত্রছাত্রীরা সব শিকারা নিয়ে আসে স্কুলে। ফিরে এলাম প্রায় রাত দশটা। চলার পথে গা ছমছম। লেকে তখন কোনো শিকারা নেই। অন্ধকারে শুধু জল কাটার শব্দ। দু'পাশের ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে কেমন অশরীরি পরিবেশ মনে হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ছায়া দেখে চমকে উঠছি - মাঝি বলল - ওরা মাছ ধরছে।

নাগিন লেক

পরের দিন য়ুসমার্গ যাত্রা। উচ্চতা প্রায় ২৫০০ মিটার, গাড়িতে যেতে যেতে প্রায় দু'ঘণ্টা (হাউস বোটে থাকলে একটা শিকারা রাউন্ড ট্রিপ ফ্রি)। সেখান থেকে চারঘণ্টা ঘোড়ায় চড়ে দুধগঙ্গা নদী দর্শন। ঝিলাম নদীর একটি শাখা। চলার পথে লেক নীলনাগ, তোসা ময়দান ইত্যাদি পরে। পুরো যাত্রার পথটাই অপরূপ। পীরপাঞ্জাল পরিবৃত ফার আর পাইন গাছের মধ্য দিয়ে চড়াই-উতরাইয়ের পথ এই আলপাইন উপত্যকায়। শীতকালে বরফে ঢাকা থাকে। জম্মু-কাশ্মীর সরকার এখানকার উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে সক্রিয়। যাক্... শেষের দিকে পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে - হাড়-পাঁজরা ভেঙে যখন দুধগঙ্গায় এসে নামলাম - নিজেকে বেশ 'অভিজ্ঞ' মনে করে পরিতৃপ্ত হলাম। পরমুহূর্তেই ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম। পা একেবারে অবশ! ওখানকার ছোট ছেলেমেয়েরা কোনোমতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। অতএব 'অভিজ্ঞতা' গোড়াতেই একেবারে যাকে বলে ফুটো বেলুন! স্কুল থেকে ছেলেমেয়েগুলো এখানে পিকনিক করতে এসেছে। বড় ছোট পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ফেনিল স্রোতস্বিনী - মুগ্ধতা।

পাহলগাম। পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ অল্প কিছু গুছিয়ে (বড় বাক্স-প্যাঁটরা রেখে গেলাম বোটে) রওনা হলাম পাহলগাম এর উদ্দেশ্যে। মাত্র ১০০ কিমি শ্রীনগর থেকে। কোনো পাহাড়ি বাঁক নেই। এনএইচ-১ ধরে সোজা রাস্তা। আড়াই ঘণ্টার পথ। পথে পড়ল শালিমার বাগ। পাহাড়ে ঘেরা এই বাগান। ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে পটচিত্র ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। যেন ফ্রেমে বাঁধানো অনেক ছবি। বাহবা দিতে হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরকে এমন একটি জায়গা নূরজাহানকে উপহার দেওয়ার জন্যে। চশম-এ-শাহিতে ঝরনার ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেলাম। পথে পড়ল পাম্পোর - দু'দিকে অজস্র জাফরানের দোকান ও ক্ষেত। অক্টোবরে এর ফুল ফোটে - পরাগ থেকে তৈরি হয় এই কেশর। পাহলগাম এর কাছাকাছি দু'দিকে শুধু আপেল, অ্যাপ্রিকট (খোবানি)-র গাছ। আর রয়েছে দুদিকে উইলো গাছের সারি। এই স্থানের উচ্চতা ২০০০ মিটারের কিছু বেশি এবং অনন্তনাগ অঞ্চলের অন্তর্গত। অমরনাথ যাত্রা শুরু এখান থেকেই। লিডার নদী চলেছে রাস্তার পাশে পাশে। এর জন্ম সোনামার্গ এর কাছে কোলহাই গ্লেসিয়ার থেকে। আমাদের ছোট গেস্ট হাউসটি একেবারে নদীর বিপরীত দিকে শহরের বাইরে। যেন স্বর্গাবাসে উঠলাম। সব কিছুই এখানে স্বর্গীয়। পাইন এবং ফারের উঁচু মাথাগুলি অনবরত বাতাসের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। নীচে প্রবাহমান স্বচ্ছ নীল নদীর ফেনিল কলরব। গাড়ি বিদায় নিল। ট্রিপ-এর জন্য স্থানীয় ট্রান্সপোর্ট নিতে হবে। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম হাঁটাপথে ছোট শহর ঘুরতে। এখানকার শীতের পোশাক অনেক সস্তা শ্রীনগর থেকে। রাত্রে অসাধারণ একটা ডিনারের পর গাইডের সঙ্গে পরের দিনের প্ল্যান তৈরি হল - তুলিয়ান লেক। এর উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ মিটার! আগেই বলেছি য়ুশমার্গে আমার 'অভিজ্ঞতার'-র কথা। অনেকটাই সাহস করে রাজি হয়ে গেলাম। প্রায় দশ ঘণ্টার মতন যাত্রা।

য়ুশমার্গ

বৈশরণ ভ্যালি

পরের দিন সকাল সাতটার মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। সুন্দর দিন - শান্ত - রোদে ঝক ঝক করছে চতুর্দিক। উতরাইয়ের পথে তিন-চারবার বিশ্রামের দরকার। কিছু পরেই এল বৈশরণ - স্থানীয় লোকেদের মতে - ক্ষুদে সুইজারল্যান্ড - সত্যি বটে। আবার স্বর্গীয় কথাটাই বার বার মনে পরে। সবুজ মখমলের মতন উপত্যকা, পাহাড়ি ঝরনা, পাথুরে নদীর কল কল শব্দ, সবুজ পাহাড়ের ঢাল, ঘন পাইন,ফার গাছের সারি। জিপসিদের কাঠের ঘর পাহাড়ের ঢালে, এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অলস পাহাড়ি ভেড়া... সব কিছুর মধ্য দিয়ে চলা, দেখা, অনুভব করা এবং সর্বোপরি স্পর্শ করা। জিপসিদের হাতে চা খেলাম। গাইডের তুলনা নেই। দুজনে মিলে পুরোদস্তুর রান্না খাবার পিঠ ব্যাগে বয়ে নিয়ে এসেছে। গ্লেসিয়ারের কাছে বসে - পাহাড়ি নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে আমাদের দুপুরের গ্র্যান্ড লাঞ্চ। ডাক ঘরের অমল - কোন কিছু না দেখেই এসব কল্পনা করেছে। আমি বলতে পারছি সব কিছু সত্যি দেখে এবং ছুঁয়ে! ট্রেক থেকে ফিরে এসে হট শাওয়ার। ওয়াকিলের হাতের অসাধারণ রান্না খেয়ে সবাই হট ব্যাগ আর ব্যথার মলম মেখে সটান বিছানায়। চোখে জড়িয়ে এলো ঘুম। ঠিক ভোর পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল নদীর একটানা গর্জনে। চলে গেলাম প্রভাতী আলোয় এবং তাজা হাওয়ায় নিজেকে স্নাত করতে। বাতাসে ফার গাছের গন্ধ। গেট থেকে বেরিয়ে যে পাথুরে রাস্তা - তার পাশাপাশি চলেছে এই পাহাড়ি নদী। তারই পথে পথে মিলিটারি টহল।

গাড়ি ঠিক ন'টায় এসে হাজির। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিলাম পাহলগাম থেকে। এখানে থেকে গাড়ি ভাড়া করে কাছাকাছি আরু ভ্যালি, বেতাব ভ্যালি এবং চন্দনবাড়ি যেতে পারা যায়। প্রায় বিকেল তিনটে নাগাদ পৌঁছলাম। আজ শ্রীনগরে শেষ দিন। কাল শুরু হবে যাত্রা লাদাখ অঞ্চলের পথে। শেষ দিনের মতন শিকারায় নিশি ভ্রমণ। শান্ত নাগিনের বুকে শিকারা চলে আরও নিঃশব্দে - অন্ধকারে। জল রেস্তঁরা ম্যাক - সেখানে রাত্রের কফি খেয়ে ফিরে আসা নিজেদের নৌকো বাড়িতে। চোখে ঘুম, মনে উত্তেজনা - পরের দিন সম্পূর্ণ এক অচেনা অজানা জায়গা দেখবার জন্য।

কারগিল-লাদাখ। সকাল সাতটার মধ্যে গাড়ি রেডি। জিনিসপত্র তুলে দিয়ে চলতে শুরু করল। এনএইচ-১ডি - শ্রীনগর -লাদাখ হাইওয়ে। জাহুর - অতি দক্ষ এবং শিক্ষিত ড্রাইভার। স্থানীয় ইতিহাস নখদর্পণে। ঝিলাম বিদায় নিল। স্বাগত জানাল সিন্ধু নদ (Indus River)। ছোটবেলায় ভূগোলে কতবার পড়েছি কতভাবে, এত বছর পর তাকে দেখতে পেয়ে মনে হল অনেক আগে থেকেই যেন চেনা। এই সিন্ধু নদ চলে সারা রাস্তা - কারগিল পৌঁছনোর একটু আগে বাঁক নেবে ভারতবর্ষ থেকে - পাকিস্তানের দিকে। তখন তার সঙ্গে থাকবে জাঁসকর নদী।

দশটার কিছু আগে পৌঁছলাম সোনমার্গ। স্বর্গের শেষের ধাপ হয়ত। সৌন্দর্যের কোন কুল কিনারা নেই। বরফে মোড়া পাহাড়, সবুজ পাহাড়ের ঢাল, ঘন পাইন, ফারের উঁচু গাছ, মখমলের মতন ঘাসে ঢাকা আলপাইন উপত্যকা। আর এক আকর্ষণ হল সিন্ধুতে ট্রাউট মাছ ধরা। আমরা এখন ২৮০০ মিটার উঁচুতে। অনেক নীচে দেখা যায় বালতাল উপত্যকা। রঙিন তাঁবুগুলোকে মনে হচ্ছে ছোট ছোট বিন্দু। সেখানে এখন অমরনাথ যাত্রীদের ভীড়। সোনমার্গ এবং পাহলগাম- এই দুদিক দিয়েই যাওয়া যায় অমরনাথে। পৌঁছলাম এসে 'জিরো পয়েন্ট'-এ। আর চার কিমি পরেই জোজি লা। এরপর আর পেছন ফেরা নয়। চরৈবতি... রাস্তা ক্রমশঃই কঠিনতর এবং সঙ্কীর্ণ হতে শুরু করেছে। ড্রাইভার অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে গাড়ি চালালেও - পুরোপুরি প্রকৃতির প্রতি মনসংযোগ একটু দুরূহ হয়ে ওঠে। চলে এলাম জোজি লা মাউন্টেন পাস-এ। উচ্চতা ৩৫০০ মিটার! গেটওয়ে টু লাদাখ। বিআরও (BRO)-এর দায়িত্ব এই রাস্তা ঠিক রাখার। এদের জওয়ানরা ঈশ্বর তুল্য! এখানে স্লেজ-এ চড়ে বরফের উপর ছোট বড় সবাই আনন্দে মত্ত। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জোজি লা-র পর থেকে বেশ হঠাৎ করেই মানুষ, ভাষা ও প্রকৃতির দৃশ্যপট বদল। সবুজ ক্রমেই ফুরিয়ে এলো। পথে পড়ল 'ওয়েলকাম টু লাদাখ রিজিওন' - জুলে! অবশেষে দ্রাসে পৌঁছলাম। শুনশান জায়গা। এখানে সারা হল দুপুরের খাওয়া - ল্যাম্ব কারি, রাইস। কারগিল পৌঁছনোর কিছু আগে পড়ল কারগিল ওয়ার মেমোরিয়াল। চলতে চলতে (যেখানে সিন্ধু নদ বেঁকে গিয়েছে পাকিস্তানের দিকে) রাস্তার বাঁদিকে টানা ইঁটের দেওয়াল। বেশ উঁচু ও পুরু। জাহুর জানালেন, বিপরীত দিকে অদূরেই পাক-ভারত লাইন অফ কন্ট্রোল। সেখান থেকে গোলা বারুদ প্রায়ই ছুটে আসে। সাধারণ মানুষের জীবন বিব্রত করে। স্থানীয় সরকারের তরফে তাই এই ব্যবস্থা।

কারগিল শহর। উচ্চতা ২৭০০ মিটার। যাত্রীরা এখানে এসে এক রাত্রি থাকে। শ্রীনগর ও লেহ-এর মাঝামাঝি জায়গা। শীতের সময়ে (- ৪৮ ডিগ্রি) কোন টুরিস্ট আসেনা - জিনিষপত্রের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি। পরের দিন সকাল। যাত্রা চলল সুরু নদী (সিন্ধুর শাখা)-র ধার দিয়ে - পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকা - আবার পাহাড়ে ওঠা। সামনে এল উঁচু গিরিপথ নামিকা লা - এর উচ্চতা ৩৮০০ মি। চারিদিকে শক্তিশালী হাওয়া আর ধু ধু করছে জাঁসকর রেঞ্জের রুক্ষ পাহাড়ের স্তর। যত্র তত্র বরফ জমে আছে। পরের গিরিপথের উচ্চতা আরও বেশি। পৌঁছলাম ফোতু লা-তে। এর উচ্চতা ৪২০০ মি। এই শ্রীনগর-লেহ্ এন এইচ ডি১-এর পথে ফোতু লা-ই উচ্চতম স্থান। ফটো নেওয়ার পালা। গাড়ি থেকে নামতেই মনে হল মাথার ওপর বেশ ভারী চাপ। হাওয়া বইছে প্রচণ্ড। সবাই চটপট ফটো তুলে তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পথে পড়ল খালাতসি গ্রাম - চেক পয়েন্ট। লাঞ্চ পয়েন্ট।

থিকসে মনাস্ট্রি

আমরা তিব্বতীয় বুদ্ধের দেশে এলাম। আমার খানিক অলটিচিউড সিকনেস শুরু হয়েছিল আগেই। তবে সেটা ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল - কারণ এরপর শুধু নীচের দিকে নামা। ৪২০০ মি থেকে ৩৫০০ মি। লেহ্। মাঝখানে গাড়ি দ্রুত চলল অস্বাভাবিক এক সমতল উপত্যকা দিয়ে। পথে পড়ল লামায়ুরু মনাস্টারি - চলন্ত গাড়ি থেকেই ছবি তোলা হল। এখানে স্থানীয় গাড়ির একমাত্র থামার অধিকার আছে। লামায়ুরু এবং আলচি যেতে হলে লেহ্ থেকে গাড়ি নিয়ে আসতে হবে। লেহ-তে পৌঁছে রেস্ট নিয়ে বিকেলে দেখতে গেলাম শান্তিস্তুপ। পাঁচ দিনের জন্য স্থানীয় ড্রাইভারকে নেওয়া হয়েছে। পরেরদিন রেস্ট। হাই অল্টিচুড অ্যাক্লাইমাটাইজেসনের জন্য। হোটেলই ইনারলাইন পারমিটের ব্যবস্থা করল সেদিন। নুব্রা ভ্যালি এবং প্যাংগং লেক-এর জন্য। বিকেল চারটে নাগাদ ঘুরে এলাম থিকসে মনাস্টারি - বিশাল গোম্ফা। লাসার পোতালা প্রাসাদের সমতুল্য। পরের দিন বড় জার্নি। লোকেদের মুখে রাস্তার বর্ণনা শুনে মনে মনে বেশ দমে গেলাম। যাই হোক, রাতে অলটিচিউড সিকনেসের ওষুধ ডায়ামোক্স খেয়ে শুয়ে পড়া হল।

প্যাংগং লেকে সূর্যোদয়

প্যাংগং। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ন'টা নাগাদ গাড়িতে উঠে বসলাম সবাই। রাস্তা ক্রমশঃই খারাপ হতে শুরু করে। ঝাঁকুনিও প্রচুর। লক্ষ্য চাং লা। উচ্চতা ৫৩৬০ মি! স্থানীয় লোকেরা চাং-পা নামে ডাকে। ভারতীয় সেনার সংরক্ষিত এই জায়গা - চিন সীমান্তের দৌলতে। খুব ঘন ঘন রাস্তার বাঁক। দুদিকে ন্যাড়া পাহাড়গুলো বরফে মোড়া। চাং লা পৌঁছনোর আগেই গাড়িতে অসুস্থতার লক্ষণ। ওষুধ কাজে লাগল না। ওখানকার ব্ল্যাক টি খেয়ে রওনা হলাম অতঃপর। এবারের রাস্তা অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃশ্যপট ঘন ঘন পরিবর্তন হতে লাগলো। কখনও রুক্ষ পাহাড় পরিবৃত শস্য শ্যামলা উপত্যকা (সর্ষের খেত), কখন পাথুরে মাটি, ঝুর ঝুরে বালির পাহাড়, কখনোবা বালিয়াড়ি। দু'চোখ ভরে দেখবার শেষ নেই। হঠাৎ দুটো ঢালু পাহাড়ের মাঝখানে এক চিলতে নীল রং। নজরে এলো লেখা - 'ফার্স্ট সাইট অফ লেক প্যাংগং'। ক্রমশঃই বাঁকে বাঁকে নীল লেক বিভিন্ন ভাবে ধরা দিতে লাগল। এর উচ্চতা প্রায় ৪৩০০ মি। শীতকালে পুরো লেক হয়ে যায় বরফের চাঁই। এর দুভাগ ভারতের, আর তিন ভাগ চিনের। একসময় লেকের ধার দিয়ে সোজা ড্রাইভ। বাঁদিকে হৃদয় স্তব্ধ করা শান্ত নীল লেক। বেলা তখন প্রায় তিনটে। অসম্ভব জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কয়েকটি তাঁবু ঘুরে অবশেষে সিদ্ধান্ত হল প্যাংগং লেক রিসর্টে থাকবার। পরের দিন ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখা হল - লেককে ঘিরে বরফে মোড়া পাহাড়ের চূড়াগুলোর ওপর সূর্যের হলুদ নরম আলো বিভিন্ন সময়ে যখন এসে পড়ল, মনে হল প্রকৃতি যেন একটি একটি করে রাজমুকুট পরিয়ে দিল। লেকের ধারে কিছুক্ষণ হেঁটে এবার ফেরার পালা। লেহ্ তে ঢুকবার কিছু আগে হেমিস মনাস্টারি দর্শন হল। পরের দিন রেস্ট এবং শপিং। চপস্টিকে লাঞ্চ। তিবেতান কিচেনের খ্যাতি আছে। সুযোগ হয়নি।

খারদুং লা

নুব্রা ভ্যালি। পরের দিন ঠিক সাতটায় গাড়ি হাজির। হোটেল থেকে ঝটিতি ব্রেকফাস্ট প্যাক করে দিল। অবশেষে নুব্রা ভ্যালি! পথে পড়বে খারদুংলা পাস - যার উচ্চতা ৬০০০ মিটার! সবাই মন শক্ত করলাম, এবার দুটো করে ডায়ামক্স খাওয়া হয়েছে। মিনি অক্সিজেন প্যাক রেডি। সবাই বলল - সাউথ পুল্লু থেকে নর্থ পুল্লু রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। চাং লা-র পথকেও হার মানে। অতএব যাত্রা শুরু। জিম্মি একটি সুর বাজাচ্ছে - শান্ত স্তোত্র। পরে বুঝলাম ওটা মনকে শান্ত রাখার জন্য। বেশ অনেকক্ষণের সুন্দর যাত্রা। ধীরে ধীরে এক উচ্চতা থেকে আর এক উচ্চতা পেরিয়ে যাওয়া। আমাদের অভিজ্ঞ ড্রাইভার বলল - নীচের দিকে না তাকানোই ভাল। তুষারাবৃত কারাকোরাম রেঞ্জ - বাঁকে বাঁকে - বিভিন্ন মোহিনী রূপে দেখা দিচ্ছে। ক্রমঃশই বরফের ধারা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। খারদুংলার কাছাকাছি একটি বাঁকের পর হঠাৎ দেখি দুদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় জুড়ে বরফে ঘেরা - অনেক ওপরের দিকে তাকালে একটি বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, ওটাই নাকি খারদুংলা পয়েন্ট! আর দেখা যায় দেশলাই বাক্সের মতন গাড়ির সারি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। প্রতিটি বাঁক বেশ চ্যালেঞ্জিং। অবশেষে পৌঁছলাম। আরে! ভুলেই গেলাম - কোথায়! কেউ তো অসুস্থ হইনি! বুঝতে পারলাম আমরা অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। চারিদিকে বাইকের ভিড়। বিদেশি-বিদেশিনী আর ভারতীয় মেয়েরাও। এছাড়া বিদেশ থেকে অ্যাডভেঞ্চারিস্টরা পেডাল বাইকে করে এই পয়েন্টে আসে। তবে বেশীক্ষণ থাকার উপায় নেই, নিয়মও নেই। ফটো ইত্যাদি তুলে - একটু নীচে খারদুংলা ভিলেজ - সেখানে রেস্ট নেওয়া হল। খারদুংলা পেরিয়ে এসে পড়লাম নুব্রা উপত্যকায়। এবারের পথের সঙ্গী শায়ক নদী। এর পরের রাস্তা চমৎকার। আরও উচ্চতার ভয় নেই। তবে পথে ঘন ঘন চেক পোস্ট। সব করে দুপুর নাগাদ এলাম খালসারে। খালসার থেকে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে গিয়েছে। ডানদিকের রাস্তায় সুমুর, পানামিক এবং বাঁদিকে দিসকিট, হুন্ডার এবং

তুরতুক। আমরা সুমুর-এ লাঞ্চ সেরে পানামিক-এ হট স্প্রিং দেখতে গেলাম। আমাদের সঙ্গী এখন নুব্রা নদী। পানামিক-এর পরে সিয়াচেন বেস ক্যাম্প। সাধারণের দৃষ্টির বাইরে। পানামিক হল এই পথের সর্বশেষ গ্রাম। সুমুর মনাস্টারি দেখে ফিরে এলাম খালসার-এ। এবার বাঁদিকের রাস্তায় দিসকিট এবং শেষে হুন্ডার-এ রাত্রিযাপন। দিসকিট মনাস্টারি - পাথুরে পাহাড়ের গায়ে অসাধারণ সেট আপ। মনাস্ট্রিগুলো একই ধরনের, কোনটা আকারে ছোট বা বড়। প্রায় তিনটের সময় নুব্রা উপত্যকার প্রধান শহর দিসকিট-এ পৌঁছলাম। আইন কানুনের সব কাজ - এখান থেকেই হয়। এর পরের গন্তব্যস্থান হুন্ডার - মরুভূমি পরিবৃত মরুদ্যান। চতুর্দিকে রুক্ষ পাহাড়, সঙ্গে বালিয়াড়ির ঢাল, মাঝখানে নদী ও সবুজের সমারোহ। রাত্রিযাপন নুব্রা অর্গানিক রিট্রিট-এ। আট একর জমি নিয়ে এই অতিথিনিবাস। প্রত্যেকটি তাঁবু সুইস ডিলাক্স। চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা রকমের আকর্ষণ। ছোট ছোট ঝোরা, তার ওপরে ছোট সাঁকো। ট্রি হাউসে চা খাবার সরঞ্জাম। সেখানে গাছে গাছে ধরে আছে আপেল, অ্যাপ্রিকট। অরগানিক ভাবে চাষ করা হয় সমস্ত সবজি, ফল। সেই খেতের সবজিতে রান্না হয় - সব অতিথিদের জন্য। খেত পরিভ্রমণ করাও একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। যাই হোক, তাড়াতাড়ি চা শেষ করে রওনা হলাম উটের পিঠে চড়বার জন্য - দু-কুঁজওলা ব্যাকট্রিয় উট। চারদিকে মনে হয় যেন লাল পাথুরে মাটির পাহাড়। সামনে বালিয়াড়ি। আবার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট নদী। যেন রূপকথার রাজ্য। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। নানা রঙের আলো আর আঁধারির খেলায় মেতে উঠল নুব্রা উপত্যকা। পরের দিন ভোরবেলায় উঠে 'টি সেন্টারে' চলে এলাম। বিভিন্ন প্রকারের চা তৈরি করে রাখা আছে ফ্লাস্কে। সুন্দর খোলামেলা বসবার জায়গা।
এরপর বিদায়ের পালা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। লেহতে পৌঁছে গেলাম ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে। মন খারাপের পালা। কাল সকালে এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট - দিল্লি উড়ে যাবার। ইচ্ছে ছিল মোটর পথে লেহ থেকে সারচু, রোটাং পাস, মানালি হয়ে দিল্লি যাওয়ার। বাদ সাধল প্রকৃতি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় হিমাচল প্রদেশ তখন টইটম্বুর। অতএব... দিল্লি চলো। প্লেনের জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে মনে হল যেন সব পাহাড়গুলোতেই চড়েছি... ছুঁয়েছি...সব কিছুই চেনা মনে হতে লাগল...।

~ কাশ্মীরের তথ্য ~ কাশ্মীরের আরও ছবি ~ লাদাখের আরও ছবি ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী শুভ্রা মিত্র বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। আই টি-তে কর্মরত। নেশা নাটক পরিচালনা এবং অংশগ্রহণ। ভালোবাসেন বই পড়তে, বেড়াতে এবং ছোটগল্প লিখতে। এই প্রথম ভ্রমণকাহিনি লেখা। অবসর সময়ে 'আমাদের ছুটি' তাঁর ক্লান্তি দূর করে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

হঠাৎ ইচ্ছার নৃসিংহনাথে

সুদীপ চ্যাটার্জি

কথায় আছে না পায়ের তলায় সরষে, আমাদেরও আসলে তাই। মানসকাকু হঠাৎ বললেন নৃসিংহনাথ যাবি? আমরাও তৎক্ষণাৎ রাজি। আমরা বলতে অবশ্য সাকুল্যে আমি আর অনুপম। ট্রেনে রোজ যাতায়াত করার সুবাদে পরিচয়। প্রায় জনা পনের রোজ যাতায়াত করি। নিজেদের মধ্যে প্রায়শই বেড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়। এরকমই একদিন মানসকাকুর ওই কথা আর আমাদের নৃসিংহনাথ ভ্রমণের পরিকল্পনা। এই ছোট্ট ভ্রমণে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তারই কিছুটা আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব বলেই এই লেখা। সাহিত্য কতটা পাবেন জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে একটি স্বল্প পরিচিত স্থানের সঙ্গে পরিচয় করাতে চেষ্টা করব।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা হয়, পরিকল্পনা হয় জোরদার, শেষে পরি উড়ে চলে যায় আর কল্পনা পড়ে থাকে। ভাগ্যের ব্যাপার এই ক্ষেত্রে সেইরকম হোল না। পরিকল্পনা হওয়ার তিন দিনের মাথায় ২২ জানুয়ারি হাওড়া স্টেশনে সম্বলপুর স্পেশাল ট্রেনের তাৎক্ষনিক রিজার্ভেশন করে আমাদের যাত্রা শুরু। পরদিন ন'টা নাগাদ সম্বলপুর পৌঁছলাম। স্টেশনের বাইরে নৃসিংহনাথ কীভাবে যাওয়া যায় তা জিজ্ঞেস করে একটা অটোতে করে আইন্থাপালি বাসস্ট্যান্ডে এলাম। চল্লিশ টাকা ভাড়া নিল। বাসস্ট্যান্ডে এসে কিন্তু জানা গেল সরাসরি নৃসিংহনাথ যাওয়ার বাস এখন আর নেই। একজন শুভানুধ্যায়ী বললেন আপনারা এখান থেকে বড়গড় চলে যান। সেখান থেকে পাইকমাল যাওয়ার বাস পাবেন আর পাইকমাল থেকে নৃসিংহনাথ মাত্র ৪ কিমি।

অগত্যা আমারা ওই ভদ্রলোকের কথামতো বড়গড়গামী বাসে চড়ে বসলাম। সম্বলপুর থেকে বড়গড়-এর দূরত্ব ৪৫ কিমি-র কাছাকাছি। এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মত সময় লাগলো। আমাদের বাসের কন্ডাকটর পাইকমাল-এর বাসে বসার ব্যবস্থা করে দিল। বাস কিছুক্ষণ পরে ছাড়বে তাই প্রথমে ইডলি দিয়ে ডান হাতের কাজটা সেরে নিয়ে কাছেপিঠে একটু ঘুরে নিলাম। এটিএম থেকে কিছু টাকা তুলে নিয়ে স্ট্যান্ডে ফিরে দেখি বাস ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পথে খাওয়ার জন্য পাউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি কিনতে হয়েছে কারণ বড়গড় থেকে পাইকমাল-এর দূরত্ব প্রায় ১২০ কি.মি। মোটামুটি সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো যাত্রা। মাথাপিছু ভাড়া ৭০ টাকা। শেষের এক ঘন্টা পথ অতি মনোরম। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট পাহাড়, হালকা জঙ্গল, তার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের বাস। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ পাইকমালে এসে পৌঁছলাম। ছোটোখাটো কয়েকটা দোকান ঘর আর কিছু বাড়ি নিয়ে পাইকমাল জনপদ। এখান থেকে অটো নিয়ে গন্ধমাদন পাহাড়ের ঢালে নৃসিংহনাথ মন্দিরে পৌঁছে গেলাম।

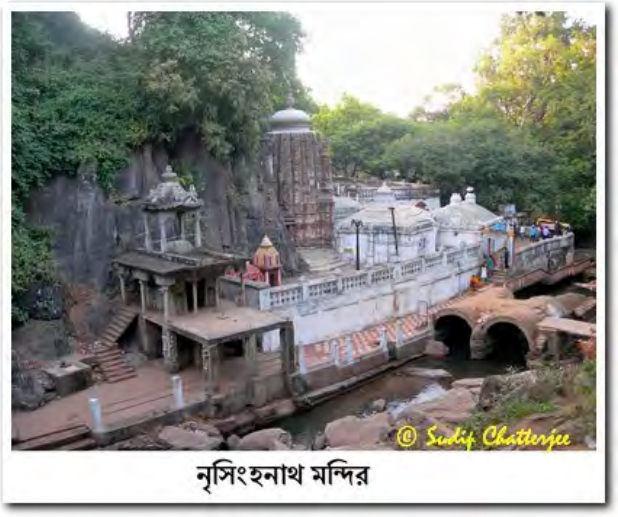

নৃসিংহনাথ মন্দির

এবার একটু ইতিহাসের কথা বলে নিই। আনুমানিক ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে পাত্নাগড়ের রাজা বৈজল সিং দেব এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৫ ফুট উচ্চতার মন্দিরটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার-এর জন্য সংরক্ষিত। দ্বিতীয় অংশটি বরাদ্দ হয়েছে মদনমোহন-এর জন্য। পর্যটক হিউয়ান সাং-এর সময়ে এই এলাকাটি বৌদ্ধ সাধনার একটি পীঠস্থান ছিল। এখন যদিও তার চিহ্ন চোখে পড়ে না।

ফিরে আসি বর্তমানে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ সুন্দর বললেও বোধহয় কম বলা হয়। গন্ধমাদন তার অনুচরদের নিয়ে সবুজ বৃক্ষের পোশাক পরে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই বোধহয় এই অঞ্চলের সঙ্গে হনুমানের কোন যোগাযোগ থেকে থাকবে। অজস্র বাঁদর ঘোরাঘুরি করছে চারপাশে। তবে এরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। আর এই গন্ধমাদনের কোলেই ঠাঁই পেয়েছে সুপ্রাচীন নৃসিংহনাথ মন্দির। মন্দিরের গা দিয়ে কলকল করে বয়ে চলেছে একটি পাহাড়ি ঝরনা। মন্দিরে খোঁজ নিয়ে জানলাম গন্ধমাদনের বুক চিরে ছুটে চলা এই দুরন্ত বালিকাটির নাম পাপহারিণী। এখানে থাকার জায়গা বলতে সাকুল্যে দুটি - মন্দির কমিটির ধর্মশালা ছাড়াও ওটিডিসি-র একটি পান্থনিবাস। পান্থনিবাসটির অবস্থান বেশ সুন্দর জায়গায়। আমাদের ভ্রমণ শুরু হয়েছিল হঠাৎই, তাই থাকবার কোন জায়গা ঠিক না করেই পথ চলাও শুরু হয়েছিল। পান্থনিবাসের সামনে দেখি অনেক মানুষজনের ভিড়। ম্যারাপ বেঁধে ভোজপর্ব চলছে। দেখেশুনে বুঝলাম বিয়েবাড়ি। আমরা এদিকে ভাবছি এতটা এসে আবার না ফিরে যেতে হয় থাকবার জায়গার অভাবে। মানস কাকু গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল অনুষ্ঠান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঘর পরিষ্কার করে আমাদের দেওয়া হবে। এরমধ্যে অনুপম বিয়েবাড়ির এক কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমাদেরও ডাকছে। অনুপমের খাতিরে আমাদেরও বিয়েবাড়ির বেশকিছু মিষ্টি খাওয়া হল।

পাপহারিণী

ডাবল বেডের ঘরগুলো বেশ বড় এবং পরিষ্কার-পরিছন্ন। এইরকম একটি ঘর আমাদের জন্য বরাদ্দ হল। নৃসিংহনাথে রাত্রিবাস করে খুব কম সংখ্যক মানুষ, তাই শান্ত, নিঃস্তব্ধ পরিবেশে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায় খুব ভালোভাবে। রাতের আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় নক্ষত্রলোকের পুরোটাই চোখের সামনে এসে হাজির হয়েছে। ইতিমধ্যে অনুপম খবর নিয়ে এসেছে মন্দিরে বিনামূল্যে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গেলাম মন্দিরে। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। মন্দিরের ঠিক সামনের চাতালে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশে ঝর্নার কলধ্বনি, টিমটিমে আলো, ঠাণ্ডা বাতাসের কামড় সব মিলিয়ে এক অসাধারণ পরিবেশে গরম গরম ভাত, ডাল, তরকারি আর পায়েস সহযোগে আহার এখনও মুখে লেগে আছে।

রাত্রিবেলায় পান্থনিবাসে ফিরে কেয়ারটেকারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল মন্দির থেকে কিলোমিটার পাঁচেক হেঁটে গেলে একটি জলপ্রপাত আছে, নাম কপিলধারা। পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে বেরোলাম পান্থনিবাস থেকে। চারদিকে ছোট ছোট জঙ্গলময় পাহাড়ে সোনালি রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে। এক শান্ত পরিবেশে মন্দিরে এলাম, এখান থেকেই আমাদের কপিলধারার যাত্রা শুরু হবে। মন্দির থেকে বেশ কিছু সিঁড়ি ভাঙার পর ঝরনাধারা পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ বরাবর এগিয়ে চললাম। আমাদের বাঁ পাশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রকৃতির আপন খেয়ালে বয়ে চলেছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে হালকা রোদের আভা গায়ে একটা উষ্ণতার আমেজ নিয়ে আসছে। শেষের কিছুটা ছাড়া পুরো পথ জুড়েই হালকা চড়াই। প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটার পর আমাদের কাঙ্খিত স্থানে এসে পৌঁছলাম। প্রায় ৪০-৫০ ফুট উচ্চতা থেকে ধাপে ধাপে নেমে আসছে কপিলধারা। শীতকাল বলে জল কিছুটা কম। আমরা ওই কনকনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে নেমে পড়লাম প্রবল শীত অতিক্রম করে। সেই নিস্তব্ধ নির্জন শান্ত প্রকৃতির কোলে বসে থাকার অনাবিল আনন্দের স্বাদ যে নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি না করেছে তাকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

কপিলধারা জলপ্রপাত

স্থানমাহাত্ম্যের গুণে কিনা জানি না, মনটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এক গভীর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করল। এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে গেল শহুরে কোলাহলে অভ্যস্ত এই হৃদয়। পাখির কলতান আর ঝিল্লির রব ছাড়া আর কোন শব্দই আমাদের কানে প্রবেশ করছে না। বসে বসে ভাবছিলাম সেই সমস্ত মানুষদের কথা যারা কয়েকশো বছর আগে এই স্থানগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন মন্দির করার জন্য বা সেই বৌদ্ধরা, যারা সাধনা করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এই নির্জন স্থান। মনে মনে তাঁদের পছন্দের তারিফ না করে পারি না।

ঝরনার বাঁদিক দিয়ে পায়েচলা একটা রাস্তা চলে গেছে আরও ওপরে। আমরা ওই রাস্তা ধরে ঝরনাটার মাথায় পৌঁছে গেলাম। সে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধ পরিবেশ। কিছুক্ষণ এই নিস্তব্ধতাকে উপভোগ করার পর ফিরে চললাম পান্থশালার উদ্দেশ্যে। পৌঁছে দুপুরের আহার সেরে বেড়িয়ে পড়লাম সম্বলপুরের দিকে। সম্বলপুর থেকে আমরা হুমা মন্দির আর মহানদীর বুকে হিরাকুদ ড্যাম দেখতে যাব। পাইকমাল থেকে সরাসরি বাসে সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সম্বলপুর।

পরদিন সকালে আবার আইন্থাপালি বাসস্টান্ড থেকে লোকাল রুটের বাস ধরে হুমার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। বাস মন্দিরের ২ কিমি আগে বড় রাস্তায় নামিয়ে দিল। গ্রামের মেঠো পথ ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম মন্দিরের দিকে। মহানদীর তীরে বেশকিছুটা হেলে পড়া একটি শিব মন্দির। এমনকি ভিতরের শিব লিঙ্গটিও মন্দিরের মতোই বাঁকা। বইতে ইতালিতে পিসার হেলানো মিনারের কথা পড়েছি কিন্ত এই মহানদীর তীরে ওড়িষার এক প্রত্যন্ত গ্রামেও যে হেলানো মন্দির আছে তার খবর কটা মানুষ রাখে?

মহানদীর তীরে মন্দিরের ঘাটে অসংখ্য বড় বড় মাছ ঘোরে। এখানে মাছ মারা বা খাওয়া নিষেধ। মাছেদের খাওয়ানোর জন্য খাবার কিনতে পাওয়া যায়, অনেকে দেখলাম মাছেদের লাড্ডু বা খই খাওয়াচ্ছে। নদীর মাঝে ছোট একটি পাথরের টিলা আছে। একটি বিরাট কালীমূর্তি আছে সেখানে। মন্দিরের ঘাট থেকে নৌকা করে যাওয়া যায়। নদীর বুক থেকে হুমা মন্দিরটিকে খুব সুন্দর লাগে। হুমা থেকে ফিরে গেলাম হিরাকুদ ড্যাম দেখতে। আইন্থাপালি বাসস্টান্ড থেকে ১৫ কিমি দূরত্ব। নিয়মিত অটো চলাচল করে। প্রায় ৭৫০ বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে বিস্তৃত হিরাকুদ বাঁধের কৃত্রিম হ্রদ। একদিকে গান্ধী মিনার এবং অপরদিকে নেহরু মিনার থেকে হ্রদটির শোভা দেখা যায়। দুটি মিনারের দূরত্ব ৫ কিমি। টিকিট কেটে উঠে পড়লাম নেহরু মিনারে। পড়ন্ত বিকেলের রোদে হ্রদের শোভা ফটোফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো।

ঘন্টেশ্বরী মন্দির

সুযোগ পেয়ে চলে গেলাম ঘন্টেশ্বরী মন্দির দেখতে। আইন্থাপালি থেকে গোশালা হয়ে রাস্তা চলে গেছে বাঁ হাতে। প্রায় ১২ কিমি গেলে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। গোশালা থেকে শেয়ার জিপ পাওয়া যায় তবে মন্দিরের ২ কিমি আগে নামিয়ে দেবে। অবশ্য জীপ চালককে কিছু বেশি দিলে ওরাই বাকি রাস্তাটুকু নিয়ে যাবে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশ দিয়ে কিছুটা হেঁটে গেলে ঘন্টেশ্বরী মন্দির। পুরো মন্দির জুড়েই অজস্র ঘন্টা ঝুলছে। সবাই মানত করে ঘন্টা বেঁধে দিয়ে যায় মন্দিরটিতে। হাওয়ার বেগে ঘন্টাগুলো বাজতে থাকলে বেশ লাগে শুনতে। বৈশাখ মাসে এখানে বেশ বড় মেলা বসে। তখন অনেক লোকসমাগম হয়। মহানদীর পাশে অজস্র ঘন্টার টুং টুং, ঢং ঢং শব্দ পরিবেশটাকে মাতিয়ে তোলে।

এরপর ফেরার পালা। এবার আর ভাগ্য অত সহায় নয়। তাৎক্ষণিক সংরক্ষণ করা গেল না। অগত্যা ট্রেনের সাধারণ কামরাই ভরসা। এক রাতের ব্যাপার। কিছু খাবার নিয়ে উঠে পড়লাম। এই হঠাৎ ভ্রমণে গিয়ে যে অনাবিল আনন্দের স্বাদ পেলাম তাই আলোচনা করতে করতেই রাত কেটে গেল। খেয়াল হতে দেখি কখন যেন হাওড়া এসে গেছে।

হিরাকুদ বাঁধ

বেড়াতে ভালবাসেন সুদীপ চ্যাটার্জি, সেই সঙ্গে ভ্রমণ সংক্রান্ত বই এবং পত্রপত্রিকা পড়তেও সমান আগ্রহী। ইন্টারনেটে নিয়মিত 'আমাদের ছুটি' পড়তে পড়তেই হঠাৎ করে লেখার ইচ্ছা জেগে ওঠে। তাই এই ছোট্ট প্রয়াস। ঘষেমেজে চেষ্টা করতে করতে লিখেই ফেলা আস্ত একটা ভ্রমণ কাহিনি। এটি ২০১১ সালের ঘোরার অভিজ্ঞতা। ওড়িষার স্বল্প পরিচিত একটি জায়গার বেড়ানোর কথা।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 3
গড় : 4.00
Like 3 people like this.
tell a Friend

জন ন্যাশের খোঁজে প্রিন্সটনে

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

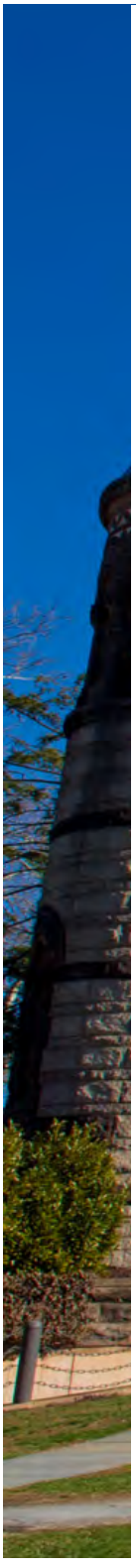

গতকাল সন্ধ্যার ঠিক আগেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বেশ ভাল বৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটা দিন গরমে আধসেদ্ধ হওয়ার পর এই বৃষ্টির জন্য তাপের ঝাঁজটা অনেকটা কমেছিল। তার ফলে রাতে ঘুমটাও ভাল হয়েছিল। সকালের পরিবেশ বেশ মনোরম। এমন সময় স্ত্রী এসে জানালেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জন ন্যাশ মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। সঙ্গে স্ত্রী অ্যালিসিয়া ছিলেন, তিনিও মারা গেছেন। সংবাদটা পেয়ে মনে হল একটা ধাক্কা খেলাম। মনটা এক নিমেষে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি চত্ত্বরে পৌঁছে গেল। এক দশকের সামান্য কিছু আগে যখন প্রিন্সটন দেখতে গেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কেবল মনে হচ্ছিল যদি জন ন্যাশের সঙ্গে দেখা হত।

জন ন্যাশের জীবন নিয়ে যে বিখ্যাত সিনেমা হয়েছিল A Beautiful Mind, এই সিনেমাটি দেখার পর অধ্যাপক ন্যাশ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আরও বেড়ে গেছিল। সিনেমাটি যখন প্রথম দেখি তখন আমরা থাকতাম মেরিল্যান্ডের রকভিলে। রকভিল শহরটি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি.-র খুব কাছেই, কিছুটা উত্তরে। অন্যান্য বড় শহরের মত ওয়াশিংটন ডি.সি.-র আয়তন আর বাড়েনি। শহরের সীমানা নির্দিষ্ট করা আছে। এই সিনেমাতে রাসেল ক্রো অধ্যাপক ন্যাশের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। অভিনেতা ক্রো অধ্যাপক ন্যাশের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হয়েছেন। লিখেছেন, Stunned... my heart goes out to John and Alicia & family. An amazing partnership. Beautiful minds, beautiful hearts.

অধ্যাপক ন্যাশের জীবনের বড় অংশ প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেটেছিল। সেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার সুযোগ হঠাৎ আমাদের সামনে এসেছিল। কিভাবে সেই সুযোগ এসেছিল তার উল্লেখ করি। আমার মামার বাড়ির গ্রামের নাম নলাহাটি। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার ৭-৮ কিলোমিটার দক্ষিণে এই গ্রাম। মামার বাড়ির গ্রামের কৃতী ছাত্র শ্রীমান সুবীর দাস এই সময় নিউ জার্সির কেনডাল পার্কে থাকত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিউ জার্সির শাখাটি এই কেনডাল পার্কেই অবস্থিত, সুবীরের বাড়ির একেবারে পাশে। স্ত্রী মধুরিমা এবং ফুটফুটে দুই কন্যা সহ সুবীর একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকত। আমরা রকভিলে চলে আসার পর সুবীরের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হল। নতুন করে যোগাযোগের সুবাদে, ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে কোন কাজ থাকলে সুবীর আমাদের কাছে চলে আসত। যেহেতু আমাদের নিউ ইয়র্ক শহর দেখা হয়নি, সুবীর লোভ দেখিয়েছিল ওদের কাছে গেলে আমাদের নিউ ইয়র্ক শহর ঘুড়িয়ে দেখাবে। সুবীরের প্রস্তাবটা আমাদের কাছেও লোভনীয় বলে মনে হয়েছিল। কারণ নিজেরা নিউ ইয়র্ক শহরটা ঘুরে দেখতে গেলে থাকার জায়গার সমস্যা হবে। তাই নিউ জার্সিতে সুবীরের কাছে থেকে নিউ ইয়র্ক ঘোরা অনেক সহজ হবে। আর সঙ্গে সুবীরও থাকবে।

সুযোগ খুঁজছিলাম কখন সুবীরের কাছে যাওয়া যায়। রকভিলে থাকাকালীন 'বেথেসডা'র Uniformed Services University Medical School-এর অধ্যাপক শৈবাল দের সঙ্গে গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলাম। তাই শৈবালকে বলে দুটো দিন বাড়তি ছুটি মঞ্জুর করে নিলাম। ঠিক হল এক বৃহস্পতিবার যাত্রা শুরু করব, আর ফিরব রবিবার। তাহলে মাঝে শুক্র-শনি দুটো দিন আমাদের হাতে থাকবে ঘুরে দেখবার জন্য।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর চায়না টাউন থেকে চিনা মালিকানাধীন বাস ছাড়ে নিউ ইয়র্ক যাবার জন্য এবং তা বেশ সস্তা। অগ্রিম টিকিট কেটে রেখেছিলাম। তাই যাত্রার দিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চায়না টাউন চলে গিয়েছিলাম হাতে কিছুটা সময় নিয়ে। বাসে পাশাপাশি দুটি জায়গা মিলেছিল। ওয়াশিংটন ডি.সি. থেকে নিউ ইয়র্ক মোটামুটি ২২৫ মাইল অর্থাৎ ৩৬২ কিলোমিটার। এতটা রাস্তা যেতে অনেকটা সময় লাগার কথা। বাসের অফিস থেকে জেনেছিলাম তিন ঘণ্টা সময় লাগবে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের আরও দেড় ঘণ্টা বেশি লেগেছিল। ওয়াশিংটন ডি.সি. শহর থেকে বের হতেই বেশ খানিকটা সময় নিয়ে নিল। শহরের ভিতরে অনেক যানবাহন তাই সময় লাগাটাই স্বাভাবিক। আর মাঝ রাস্তায় ঘন মেঘ করে তুমুল বৃষ্টি হল। বৃষ্টির সময় বাসের গতিবেগ অনেক কমাতে হয়েছিল।

এই বাস যাত্রার দুটি ঘটনা আমার আজও মনে আছে। এক, প্রত্যেক সিটের পাশে একটি করে পলিথিনের প্যাকেট রাখা আছে বর্জ্য ফেলার জন্য। ফলে বাসের মেঝে নোংরা হয় না। অপর ঘটনাটি মজাদার। আমাদের দুটি সিট আগে বসেছিলেন এক আমেরিকান দম্পতি। বাস চলাকালীন ভদ্রলোক খবরের কাগজ বা বই পড়ে পুরো সময়টা কাটালেন আর ভদ্রমহিলা খাতা-পেনসিল নিয়ে তার স্কেচ করে গেলেন।

সুবীর জানিয়েছিল নিউ ইয়র্কের পেন ষ্টেশন থেকে Northeast Corridor-এর ট্রেন ধরতে হবে। তাই বাস নিউইয়র্ক পৌঁছলে আমরা পেন ষ্টেশন ষ্টপেজে নেমে পড়লাম। পেন ষ্টেশন থেকে অন্তত ছয়-সাতটি দিকে ট্রেন লাইন চলে গেছে। আমাদের গন্তব্য নর্থইষ্ট করিডরের জার্সি অ্যাভিনিউ ষ্টেশন। পেন ষ্টেশন এবং জার্সি অ্যাভিনিউ ষ্টেশনের মাঝে এগারোটি ষ্টেশন রয়েছে। দূরত্ব অনেকটাই - সময় লাগবে এক ঘণ্টার মত। এখানকার মত লোকাল ট্রেনের ভিড় ওখানে নেই। তাই ট্রেনে জায়গা পেতে কোনও অসুবিধা হলনা। মাঝে টিকিট পরিদর্শক এসে টিকিট দেখে গেলেন। চারপাশটা দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল। সুবীর ষ্টেশনে এসেছিল আমাদের নিয়ে যেতে।

ওর বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছিল। সুতরাং সেদিন আর কোথাও আমাদের যাওয়া সম্ভব ছিল না। বরং সুবীরের স্ত্রী এবং কন্যাদের সঙ্গে আনন্দে সময়টা কেটেছিল। ঠিক হল পরদিন সকালে আমরা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়টা ঘুরে আসব। আর শনিবার যাব নিউ ইয়র্ক শহর দেখতে।

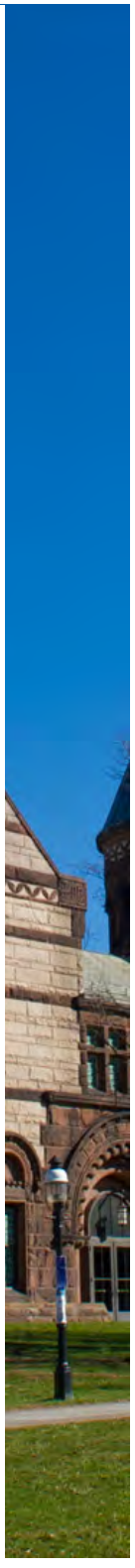

সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়লাম প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় দেখব বলে। প্রিন্সটন সুবীরের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, তবু সঙ্গে গাড়ি থাকলে সুবিধা হয়। তাই সুবীরের গাড়িতে চেপে বসলাম । সঙ্গী হল ওদের বড় কন্যা। কেনডাল পার্ক থেকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মোটামুটি ৯ মাইল অর্থাৎ ১৪/১৫ কিলোমিটার। সকালের মিঠে রোদে এইটুকু রাস্তা পার হতে বেশি সময় লাগল না। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে বসত বাড়ির পাশাপাশি ছোট ছোট দোকান, সারিবদ্ধ গাছ, রাস্তায় সামান্য দু চারটে লোক - এই সব দেখে মনে হল এটা শান্তির এলাকা। যা এদেশে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা মেলে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরটি বেশ বড়, ৫০০ একরের মত জায়গা নিয়ে এর ব্যপ্তি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু হয়েছিল বেশ কিছু কাল আগে। আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে অনেকটা, ১৭৪৬ সালে। তখন এর নাম ছিল 'কলেজ অফ নিউ জার্সি', আর এর বর্তমান স্থানেও নয়, নিউ জার্সির সব চেয়ে বড় শহর এলিজাবেথে। তারপর ১৭৪৭ সালে নিঅয়ার্ক [Newark] শহরে স্থানান্তরিত হয় কলেজটি। তার নয় বছর পর ১৭৫৬ সালে খুঁজে পায় স্থায়ী ঠিকানা। তবে স্থান নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'কলেজ অফ নিউ জার্সি'-এর নাম পাল্টাতে কেটে যায় এক শতকেরও বেশি সময়। ১৮৯৬ সালে নতুন নাম হয় প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি।

আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছে, সেটি অনেক রাস্তা পার করেছে ইতিমধ্যে - বর্তমানে বিখ্যাত আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি। এদেশের হাজার হাজার পড়ুয়া প্রতি বছর আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দরখাস্ত পাঠায় ভর্তির জন্য। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে যদি কোন ফেলোশিপ জোটে, কারণ ওদেশে জীবনধারণ শুধু নয়, পড়াশোনার খরচও অত্যধিক বেশি। ছাত্র-পিছু অনুদানের অঙ্কে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ওদেশের সেরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্ন দেখছিলাম যদি ওখানে পড়াশুনা করার সুযোগ পেতাম! অবশ্য স্বপ্ন তো অবাস্তবই হয় - যা সত্যি হবার নয়। সাধারণত ক্যামেরাটি আমার হাতেই থাকে তাই অন্যদের ছবি তোলার সুযোগ ঘটে। এবার সুবীর আমাদের সঙ্গে থাকার সুবাদে সুবীরের কন্যার সঙ্গে আমাদের দুজনের কয়েকটা ছবি তোলা হয়ে গেছিল এই বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন ন্যাশের মত বিখ্যাত বহু মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। Institute of Advanced Study-র লাইফ টাইম মেম্বার হন ১৯৩৩ সালে।

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা ছিলেন ৩৭ জন নোবেল পুরস্কার প্রাপক, ১৭ জন 'ন্যাশানাল মেডেল অফ সায়েন্স' প্রাপক, ৩ জন অ্যাবেল পুরস্কার প্রাপক, ৮ জন ফিল্ডস মেডালিস্ট, ৯ জন টুরিন অ্যাওয়ার্ড প্রাপক, ৩ জন 'ন্যাশানাল হিউম্যানাটিজ মেডেল' প্রাপক এবং ২০৪ জন 'রোডস স্কলার'। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কোন মাপের তা সহজেই অনুমান করা যায় উপরের পরিসংখ্যান থেকে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন - জেমস ম্যাডিসন এবং উড্রো উইলসন। উইলসন ১৯০২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হন ১৮৭৯ সালে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর উনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নানা কাজ করেন। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। মজার কথা এই যে কয়েক শতাব্দীপ্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে অনেক পরে। মহিলাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে প্রথম নেওয়া হয় ১৯৬৯ সালে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে রয়েছেন বিশ্বজয়ীরা, সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাস। তাই এখানে আসতে পারাটাও সৌভাগ্যের। তবে আমি জন ন্যাশের দেখা পাইনি। তাতে দুঃখ নেই। সেদিনের স্মৃতিটাই অমলিন হয়ে আছে আজও।

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব-র নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য লেখা।

বাঙালি মধ্যবিত্তের আমেরিকা দর্শন

সুস্মিতা রায়

~ শিকাগোর আরও ছবি ~

বেড়ানো বলতে প্রথমেই ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় যাওয়ার কথা মনে পড়ে। প্রত্যেক বছর বার্ষিক পরীক্ষার পর, বাবা আমাদের ভাই-বোনদের নিয়ে চিড়িয়াখানা যেতেন। সবাই মিলে সারাদিন চিড়িয়াখানায় ঘোরা, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া খাবার দাবার মাঠে বসে খাওয়া– এটা আমার কাছে যেন এক উৎসবের মেজাজ এনে দিত।

এছাড়া বাবা তাঁর স্বল্প ক্ষমতার মধ্যেও, আমাদের নিয়ে পুরী গেছেন। পরে দাদার সঙ্গে বাবা-মা, আমি ও ছোটভাই দিল্লি, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দেরাদুন, হরিদ্বার, মুসৌরি ঘোরার সুযোগও পেয়েছি। বিয়ের পর সংসারে জড়িয়ে পড়ে বেড়াতে যাবার সুযোগ না আসলেও, পরবর্তীকালে নিজস্ব ব্যবসা সূত্রে নেপাল, হায়দ্রাবাদ গেছি। জায়গাগুলুও নৈসর্গিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এহেন আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার কপালেও বিদেশ ভ্রমণ লেখা আছে!

আমাদের একমাত্র সন্তান কর্মসূত্রে আমেরিকার শিকাগো শহরে প্রতিষ্ঠিত। যেদিন ছেলে জানাল যে সে আমাদের ওর কাছে গরমের সময় নিয়ে যেতে চায় তাই পাসপোর্ট, ভিসার ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রস্তুতি করতে - একদিকে যেমন ভীষণ আনন্দ হল, ভয়ও কম করতে লাগল না। সতের-আঠার ঘন্টার বিমান যাত্রা, সঙ্গে ভাষা সমস্যা।

অবশেষে ৩১শে মে, ২০১৪ তারিখে আমরা নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে গিয়ে হাজির হলাম। এখান থেকে দিল্লি গিয়ে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে, সরাসরি শিকাগো (আমেরিকান উচ্চারণে চিকাগো)। ছেলের সঙ্গে তিন বছর পরে দেখা হবে, তাই অনেক কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকলেও, নিয়মকানুনের বাধায় অধিকাংশই সম্ভব হল না।

রাত আটটা পনের মিনিটে আমাদের নিয়ে নির্দিষ্ট উড়োজাহাজ দিল্লির উদ্দেশ্যে উড়ে গেল। দু'ঘন্টার পথ - রাত দশটার কিছু পরে দিল্লি পৌঁছলাম। এখান থেকে শিকাগোর বিমান রাত একটায় ছাড়ার কথা, তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।

প্রায় তিন ঘন্টা সময় কিভাবে কাটাব, এতটা পথ একনাগাড়ে বিমানে কাটাতে কোনও অসুবিধায় পড়বো কী না, ভাবতে ভাবতেই বিমান ছাড়ার সময় এসে গেল। রাত একটার কিছু পরে আবার আকাশে পাড়ি দিলাম। শুরু হল দীর্ঘ পনের ঘন্টার বিমান যাত্রা। আমরা পয়লা জুন এখানকার রাতে, অর্থাৎ ওদেশের সকালে শিকাগো পৌঁছবো। জানলার ধারে বসা নিয়ে এই বুড়ো বয়সেও একপ্রস্থ মন কষাকষির পর, অলিখিত মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল –যাওয়ার সময় আমার স্বামী জানলার ধারে বসে যাবে, ফেরার পথে আমি। মাঝখানের সিটে বসলাম। সামনে সিনেমা বা ছবি দেখা, ও গান বাজনা শোনার ভাল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অভাগা যেখানে যায়...। আমার সিটের জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্রটি হয় মৃত, নাহলে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন।

বিমানসেবিকা খাবার নিয়ে হাজির। খাওয়া দাওয়া সেরে চোখ বুজলাম। ভূমি থেকে কত ওপরে আছি জানি না। মনে হচ্ছে বিমানটা মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছে। মনের মধ্যে নানা উৎকণ্ঠা – কখন পৌঁছবো, দীর্ঘ তিন বছর পরে ছেলের সঙ্গে দেখা হবে, নিরাপদে পৌঁছবো তো? কিন্তু সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে আমাদের নিয়ে বিমান নিরাপদেই শিকাগো বিমান বন্দরে এসে অবতরণ করলো। মালপত্র ফেরত পেতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল। এবার শুরু হল চেকিং পর্ব, তার সাথে হাতের ছাপ নেওয়া, সঙ্গে কী কী মাল আছে – বিশেষ করে "আম" আছে কী না, ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ। সব মিটিয়ে তবে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল।

বাইরে বেরিয়েই দেখলাম ছেলে-বউমা দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। কতদিন পরে দেখলাম, মনটা আনন্দে ভরে গেল। নতুন দেশ দেখতে এসেছি না ছেলে-বউকে, ঠিক করতে আরও কিছু সময় গেল। সকালের রোদে ঝকঝকে সুন্দর এলাকা দিয়ে গিয়ে, ওর আরও সুন্দর গাড়িটায় বসে মনে হল, ছোট্টবেলা থেকে অনেক দুঃখ-কষ্টের জীবনযুদ্ধে আমি আজ জয়ী। আমার পাশে আমার প্রধান সেনাপতি, আমার একমাত্র সন্তান।

ছেলেই গাড়ির বাঁদিকে বসে গাড়ি চালাচ্ছে। এখানে ডান দিক দিয়ে গাড়ি চালাবার রীতি। গাড়ির সব আরোহীকেই সিটবেল্ট বেঁধে বসতে হয়। ওদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছতে ঘন্টা আধেক সময় লাগলো। সামনেই সবুজ লন, টেনিসকোর্ট, সুইমিংপুল। আর এই সামান্য পথে, সামান্য সময়ে যেটা লক্ষ্য করলাম, এখানে কেউ কাউকে ওভারটেক করে না, পুলিশ সদা সতর্ক, সবাই খুব নিয়মনিষ্ঠ, রাস্তায় প্লাস্টিক-পলিথিন তো দূরের কথা একটা কাগজের টুকরো পর্যন্ত কোথাও পড়ে নেই। পরিবর্তে রাস্তার দু'ধারে সবুজ গাছ আর ফুলের সমারোহ। নোংরা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, বর্জ্যপদার্থের স্তুপ দেখতে না পেয়ে, মনটা নিজের দেশ ও দেশের মানুষগুলোর জন্য হু হু করে উঠলো। যাহোক, বাড়ি পৌঁছে ছেলে আমাদের ভাল করে বিশ্রাম নিতে বলল। সত্যিই আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন, বিমানযাত্রায় যে এত ক্লান্তি আসে জানা ছিল না।

বিকেলে বেরোলাম। সুন্দর রাস্তাগুলোয় আমাদের এখানকার মতো কোন দোকান নেই, শুধু বিশাল বিশাল শপিং মল। ছবির মতো প্রতিটা বাড়ির গঠন শৈলী প্রায় একইরকম, সামনে লন ও ফুলের গাছ। ছেলে বলল, শিকাগো শহরে নিয়ে যাবে। ওখানে নাকি অনেক কিছু দেখার আছে। লং জার্নির মধ্যে মিশিগান। সেখানে একদিন থাকতে হবে। তবে সবথেকে খুশি হলাম শুনে যে ওদেশের স্বাধীনতা দিবস, অর্থাৎ ৪ জুলাই নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যাবে।

শিকাগো

শিকাগো শহর দেখতে যাওয়ার দিন ছেলের গাড়িতে করে নিকটবর্তী একটা স্টেশনে গিয়ে, সেখান থেকে শিকাগোর ডাউনটাউনের "ইউনিয়ন" স্টেশনে এলাম। এই ডাউনটাউন-ই শহরের মুখ্য

ব্যবসায়িক স্থল। ছেলে সঙ্গে সোয়েটার নিতে বলেছিল, কিন্তু বেরোবার সময় সেটা খেয়াল হয়নি। এদিকে এখানে এত ঠান্ডা হাওয়া, যে জমে যাবার উপক্রম। দোষটা আমার, তাই চুপ করে মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া গতি নেই। গোটা শিকাগোটাকেই মিশিগান হ্রদ ঘিরে রেখেছে। নামেই লেক, আসলে সেটা সমুদ্রের মতোই বিশাল। তবে শুনলাম হ্রদের জল সমুদ্রের মতো লোনা নয়, মিষ্টি জলের হ্রদ। শিকাগো মেট্রোপলিটান অঞ্চলের আশি শতাংশের বেশি মানুষ এই জলই ব্যবহার করেন। এবার উঠলাম দোতলা ট্রেনে। সুন্দর বসার ব্যবস্থা, বসার আসনও ততোধিক সুন্দর। কেউ দাঁড়িয়ে নেই - খুবই আরামদায়ক যাত্রা।

শিকাগোতে দেখতে গেলাম শেড অ্যাকোয়ারিয়াম (Shed Aquarium)। বিশাল জায়গা জুড়ে এই অ্যাকোয়ারিয়ামে বিভিন্ন রকম মাছ, জেলিফিশ, ডলফিন, পেঙ্গুইন ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রায় পঁচিশ হাজার মাছ আছে। এটা একসময় পৃথিবীর বৃহত্তম ইন্ডোর অ্যাকোয়ারিয়াম হিসাবে স্বীকৃত ছিল - প্রায় ৫০,০০,০০০ গ্যালন জল ধারণ করার ক্ষমতা আছে। শিকাগোর মিউজিয়াম ক্যাম্পাস, অ্যাডলার প্ল্যানেটোরিয়াম ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের ফিল্ড মিউজিয়াম এর চারপাশটা ঘিরে রেখেছে। একটা শো দেখলাম, যেখানে বাজনার তালে তালে ডলফিন, পেঙ্গুইনরা লাফ দিয়ে দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করছে। খুব ভাল লাগল।

এরপর একটা চিনা রেস্তোঁরায় লাঞ্চ করতে গিয়ে এতক্ষণের সব আনন্দ এক নিমেষে উবে গেল। শুনলাম চায়না টাউন থেকে একজন ওখানে গিয়ে রেস্তোঁরাটা খুলেছে। প্রতিটা খাবারের দামকে টাকার হিসাবে আনতে ষাট-বাষট্টি দিয়ে গুণ করে বুঝলাম, কোনটাই খাওয়া উচিত নয়। এক কাপ কফি ভারতের হিসেবে চারশ' টাকা দিয়ে কেনার কথা ভেবে আতঙ্কে হৃদরোগ হবার উপক্রম। আমার অবস্থা দেখে ছেলে হেসে ফেলে বললো, ওখানকার হিসেব করতে যেও না। মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমার ওনার অবশ্য মাথা খারাপের কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। অন্যান্য খাবারের সঙ্গে আমাদের এখানকার তিন টাকা ভাঁড় চায়ের মতো পরিমাণের কফির কাপে দিব্বি তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিল। তবে অস্বীকার করব না, প্রতিটা খাবার সত্যিই খুব সুস্বাদু।

এবার উইলস টাওয়ার (Willis Tower) দেখার পালা। শিকাগো শহরে সমস্ত বিল্ডিংই বিশাল বিশাল উঁচু। কিন্তু এদের মাঝে একশ' আট তলা, ১৪৫১ ফুট উচ্চতার (৪৪২ মিটার) টাওয়ারটা দেখে সেই "এক পায় দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে" মনে পড়ে গেল। সবথেকে অবাক হলাম এই জেনে যে ফজলুর রহমান খান নামে একজন বাংলাদেশি স্থপতি নাকি এই বিল্ডিংটা নির্মাণ করেছেন। ভিতরে ঢুকে টিকিট কাটার জন্য লাইন দিতে হল - বেশ ভিড়। টিকিট নিয়ে লিফটে উঠলাম। এক-একবারে দশতলা উঠে লিফট থামছে। একেবারে ওপরে গিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা হল। গোটা শিকাগো শহরটাকে একঝলকে দেখা যায়। বিশেষ করে একটা জায়গায় ওপর, নীচ ও চারপাশ কাচের হওয়ায় - সবদিকই পরিষ্কার দেখা যায়। সবাই ফটো তুলছে। আমরা চারজনও অনেক ফটো তুললাম বটে, তবে এখন বলতে লজ্জা নেই, তখন কাচ খুলে বা ভেঙ্গে গেলে কী হতে পারে ভেবে আতঙ্কে ছবি তোলার দিকে মনোনিবেশ করতে পারি নি। ভয়মিশ্রিত বিচিত্র এই অভিজ্ঞতার কথা ভুলবার নয়।

ফেরার সময় বাসে উঠলাম - ওঠার সময়েই টিকিট কেটে নিতে হয়। বাসটা আগা-গোড়া কাচ দিয়ে ঘেরা, ফলে চারিদিক পরিষ্কার দেখা যায়। দাঁড়িয়ে যাবার কোনও ব্যবস্থা নেই। মনে হল কলকাতার বাসে চাপা আর এখানকার বাসে চাপার মধ্যে কত তফাৎ, এখানে সবকিছু কত নিয়মমাফিক।

আমেরিকানরা খুব উন্নাসিক হয় বলে শুনেছিলাম। একটু দূরত্ব বজায় রেখে চললেও, ওদের ভদ্রতা, সহবত ও সৌজন্যবোধ দেখে অবাক হতে হয়। মেয়েদের ওরা খুব সম্মান করে। বাচ্চাগুলো ফুলের মতো সুন্দর, কিন্তু ছেলে প্রথমেই সাবধান করে দিয়ে বলেছিল– ওদের দূর থেকেই দেখো, গায়ে হাত দিয়ে যেন আদর করতে যেও না।

মিশিগান লাইট হাউস

ঠিক হল শুক্রবার বিকেলে মিশিগান যাব। মিশিগান একটা রাজ্য, আমরা মিশিগান-এর উত্তরভাগে, আপার পেনিনসুলা অঞ্চলে যাব। রাতটা সেখানে হোটেলে কাটিয়ে, পরদিন ম্যাকিনো দ্বীপে (Mackinac Island) যাওয়া হবে। আমাদের বাড়ি থেকে মিশিগান চার-পাঁচ ঘন্টার পথ।

গাড়িতে চড়ে লং জার্নির কথা এতদিন শুধু "এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি" র মতো শুনেই এসেছি, সুযোগ হয়নি। সুপ্ত বাসনা মনের গভীরে বাসা বেঁধেই ছিল। আজ ছেলের সৌজন্যে সেই বাসনাও চরিতার্থ হতে চলেছে! যদিও আমাদের শারীরিক কষ্ট ও অসুবিধা হবার সম্ভাবনা নিয়ে ছেলের উদ্বেগের সীমা ছিল না, আমি কিন্তু মানসিক ভাবে প্রস্তুত।

নির্দিষ্ট দিনে বেড়িয়ে পড়লাম। সুন্দর সুন্দর গান শুনতে শুনতে, সবুজ প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এখানে সামারে অন্ধকার হতে প্রায় রাত ন'টা বেজে যায়। সন্ধ্যা সাতটাতেও ঝকঝকে রোদ থাকে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। জার্নিটা দারুণ ভাবে উপভোগ করছিলাম, আর ছেলের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে ভাবছিলাম – এই কী আমার সেই ছেলে, যে সারাদিন কথায় কথায় বায়না করে ভ্যাঁভ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দিত? এই তো সেদিনও নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দিয়ে জামা, প্যান্ট, জুতো, মোজা পরিয়ে স্কুলে নিয়ে যেতাম। আনন্দে চোখে জল এসে গেল। ছেলে আজ কথায় কথায় যতই বলুক – বয়সটা একটা সংখ্যা মাত্র, মনে হল জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে গেল।

হোটেলে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট খাবার ছিল, তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। আগামীকাল সকাল সকাল বেরতে হবে।

সকালে বেরোলাম দ্বীপ দেখতে। শুনলাম এটি নাকি পর্যটকদের কাছে ভীষণ ভাবে সমাদৃত। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, যানবাহন বলতে শুধু ঘোড়ার গাড়ি ও সাইকেল। অবশ্য পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখা যেতেই পারে। যাহোক, লঞ্চে করে নির্দিষ্ট দ্বীপে গিয়ে হাজির হলাম। স্বপ্নেও ভাবিনি যে একটা জায়গায় এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। চারদিকে শুধু সবুজ। ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম। চারিদিকে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, বাড়িগুলো সব পুরোনো রীতির, নানারকম ফুলের সম্ভার, সুন্দর আবহাওয়া। সব মিলিয়ে এক অপরূপ নিসর্গ, আর তারই মাঝখান দিয়ে ঘোড়ার খুরের মৃদু শব্দ তুলে আমরা এগোলাম। ঘোড়াগুলোও দেখার মতো। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অঞ্চলে যেমন কঙ্কালসার ঘোড়া, গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, একটাও সেরকম নয়। যেমন চকচকে চেহারা, তেমনি টগবগে চলার ধরণ। এখানে "ফাজ" নামে একরকম ক্যাডবেরি জাতীয় মিষ্টির অনেক দোকান চোখে পড়লো। খেতে ভারি সুন্দর।

ম্যাকিনো আইল্যান্ড

ফেরার পথে একটা ঝরনা দেখতে গেলাম। গাড়ি রেখে

অনেকটা পথ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হল। চুরানব্বইটা সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে যেতে হবে। আমার হাঁটুর সমস্যা থাকায়, ইচ্ছা থাকলেও অনেক দূর থেকেই দেখতে বাধ্য হলাম। এই ক'দিন এদেশে এসে ভেবেছিলাম, এখানে আর সবকিছু থাকলেও মশা নেই। কিন্তু একটা জায়গায় যে কত মশার বাস হতে পারে, এখানে না আসলে অজানাই থেকে যেত। মনে পড়ল ছেলেবেলায় পড়া - "মশায়, দেশান্তরি করলে আমায় কেশনগরী মশায়।" একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। অনেকেই দেখলাম মসকুইটো নেট দিয়ে মুখ ঢেকে এসেছে। তাদের হয়তো পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। যাইহোক, মশা তাড়িয়ে, কামড় খেয়ে, কোনমতে কাটালাম। ছেলে মশার কামড় উপেক্ষা করেই বেশ কিছু ফটোও তুলল।

মিশিগান-এ আর একটা দেখার মতো জিনিস হল পিকচারড রক (Pictured Rock) নামে একটা জায়গা। লঞ্চে করে যাওয়ার সময় আপার ডেকে প্রচন্ড ঠান্ডা হাওয়ার দাপটে লোয়ার ডেকে নেমে আসতে বাধ্য হলাম। লঞ্চটা আমাদের বিভিন্ন রকম রকের ধারে নিয়ে যাচ্ছিল। খুবই সুন্দর, কিন্তু ওপর থেকেই বেশি ভাল দেখা যায় ও ফটো তোলা যায়। তাই আবার আপার ডেকেই উঠে এলাম। ঝকঝকে রোদ জলে এসে পড়েছে, তার সঙ্গে ভীষণ ঠান্ডা হাওয়া, এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

ফেরার পথে উইসকনসিন (Wisconsin), বিভিন্ন ফার্ম হাউস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বাসায় ফিরে এলাম।

এবার নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার পালা। তিনটি প্রপাত নিয়ে এই নায়াগ্রা জলপ্রপাত। বড় থেকে ছোট ক্রমান্বয়ে ওগুলোর নাম– হর্স সু ফলস (Horse shoe falls), আমেরিকান ফলস (The American falls) ও ব্রাইডাল ভেল ফলস (The Bridel Veil Falls ।)। এটি উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও পৃথিবীর অন্যতম প্রশস্ত জলপ্রপাত।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত

৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। ওইদিন নায়াগ্রা জলপ্রপাতে নানারকম আতসবাজির খেলা দেখানো হয়। তাই ছেলে অনেক আগে থেকেই ওই দিনটায় নায়াগ্রা যাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তিন তারিখ বিকেলে রওনা হলাম। ছেলের গাড়িতে প্রায় পাঁচ-ছয় ঘন্টা পাড়ি দিয়ে রাত কাটানোর জন্য একটা হোটেলে উঠলাম। পরদিন আবার যাত্রা করে, দুপুরবেলা পৌঁছে, হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, বেড়িয়ে পড়লাম।

দূর থেকে উত্তাল জলরাশির শব্দে চমকে গেলাম। নায়াগ্রা জলপ্রপাত আমেরিকা আর কানাডার মাঝে অবস্থিত। প্রপাতের কাছে এসে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। বিশাল জায়গা জুড়ে সাদা জলরাশি উদ্দাম গতিতে অতল গভীরে লাফিয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল, কানাডার দিক থেকে নায়াগ্রার ওপর রঙিন আলোর মেলায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শুনলাম রাত দশটার পরে বাজি পোড়ানো শুরু হবে। উঃ! কী যে ভিড় বলে বোঝানো যাবে না। চারদিকে লোকের ভিড়ে হাঁটার উপায় পর্যন্ত নেই। প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা ওই ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে, শুরু হল আতসবাজির খেলা। দেখে মনে হল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সার্থক, এরজন্য পাঁচ ঘন্টা কেন, পনের ঘন্টাও দাঁড়িয়ে থাকা যায়। সে যে কী দৃশ্য, মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। ওই উত্তাল জলরাশির মধ্যে যখন নানা রঙের আলো পড়ছিল, তার সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। অতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, শেষে ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরেরদিনের গন্তব্য নায়াগ্রা ভিজিটর সেন্টার। এখানে দর্শনীয় স্থানগুলোর জন্য পাস সংগ্রহ করতে হবে। এর জন্য অনেকক্ষণ লাইন দিতেও হল। উঠলাম "মেইড অফ দ্য মিষ্ট" বোটে। প্রত্যেককে নীল রঙের ফিনফিনে জ্যাকেট পরতে হল। বোট এগিয়ে চলল। সামনে আমেরিকান ফলস, বিশাল উঁচু থেকে ভীষণ শব্দে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সারা শরীর জলের ছাটে ভিজে যাচ্ছে। বোট থেকে নেমে, ঘোর কাটতে অনেক সময় নিল।

নায়াগ্রার আর এক আকর্ষণ, বলা ভালো সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, "কেভ অফ দ্য উইন্ড"। এখানে যাওয়ার জন্য সকলকে হলুদ রঙের স্বচ্ছ রেন কোট, আর স্যান্ডাল দেওয়া হয়েছিল। নায়াগ্রা নদীর সমতল থেকে লাল রঙের কাঠের সিঁড়ি এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠে গেছে। ঐ সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে প্রথমে বেশ ভয়ভয় করছিল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই, ক্রমশঃ বেড়ে চলা জলস্রোতের তীব্রতা অনুভব করতে পারছিলাম। শুনলাম পৃথিবীর আর কোথাও কোন জলপ্রপাতের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে স্রোতবেগ, জলোচ্ছাস অনুভব করার সুযোগ নেই। তীব্র জলোচ্ছাসে আকাশ বাতাস পুরো বাষ্পীয় ওড়নায় যেন আবৃত। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। বেশ কিছুক্ষণ এই সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে শুষে নিয়ে ফিরে এলাম।

কেভ অফ দ্য উইন্ডস-এর পথে

আমাদের ফেরার টিকিট আগষ্ট মাসের দুই তারিখে। কাজেই নায়াগ্রা দেখে ফেরার পরও আমাদের হাতে অনেক সময় ছিল। কাছাকাছি অনেক জায়গাই ঘুরলাম। একটি দক্ষিণ ভারতীয় ও একটি গুজরাটি মন্দির আছে। বিরাট এলাকা নিয়ে মন্দির দুটো তৈরি। অনেকটা বড় সুন্দর সবুজ লন আর ফুলের বাগান। এখানে প্রচুর গুজরাটি ও দক্ষিণ ভারতীয় বসবাস করেন। গুজরাটি মন্দিরটায় সন্ধ্যারতি দেখলাম। মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ী সামনের সারিতে পুরুষ ও পিছনের সারিতে মহিলারা বসেন। আরতি দেখে ওদের ক্যান্টিনে অনেকদিন পরে পরমানন্দে সিঙ্গাড়া ও ধোকলা খেলাম। একদিন গেলাম একটা বাংলাদেশি মার্কেটে বাজার করতে। দেখি আশপাশে সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলছে। ছেলে আমাদের পছন্দের ইলিশ, কই, পারশে, বোয়াল ইত্যাদি অনেক প্রকার মাছ কিনল। আবার একবার যাট-বাষট্টি দিয়ে গুণ করে ভাবছি, এদেশের লোকগুলো কীভাবে বেঁচে আছে? মাছ কিনতেই চার হাজার টাকার ওপর চলে গেল। ফিরে আসার আগে আরেকবার শিকাগো শহরে গেলাম। ওখানে মিলেনিয়াম পার্ক আছে। সেখানে উল্লেখযোগ্য দেখার জিনিস বিন (Bean), যাকে নাকি শিকাগোর ট্রেড মার্ক বলা হয়। ড্রপ অফ মার্কারি (Drop of Mercury) তে সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ভীষণ সুন্দর। তাছাড়া সামারে প্রতি শনি-রবিবার, মিশিগান লেকের ওপর ফায়ারওয়ার্কস হয়। আতসবাজির আলোয় চারিদিক রঙিন হয়ে যাচ্ছিল। খুব ভালো লাগল।

নায়াগ্রা জলপ্রপাতে আতসবাজির খেলা

আসলে আমেরিকানরা ওদেশের গরমের সময়টা দারুণভাবে উপভোগ করে। শীতে তো শিকাগোয় বরফ পড়ে। গরমের সময় সবাই উইকএন্ডে বেড়িয়ে পড়ে। তখন অনেকক্ষণ অবধি সূর্যালোক থাকে, আর ওরা যতটা পারে রোদটাকে গায়ে লাগাতে ভালবাসে। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে বয়স্কদের দেখে। কী সাঙ্ঘাতিক এনার্জি। কেউ কেউ আবার দৌড়াচ্ছে। ওরা সত্যিই জীবনটাকে উপভোগ করতে জানে। আমার ছেলে তো সবসময় আমাকে বলত– "তোমরা সারাক্ষণ পায়ে ব্যথা বল, এদের দেখে শেখ"।

যাহোক, দেখতে দেখতে আগষ্ট মাসের দুই তারিখ, অর্থাৎ ফেরার দিনটা চলে এল।

দুটো মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে এতদূর চলে আসা যে কতখানি বেদনাদায়ক, তা কোনও বাবা-মা ছাড়া আর কে অনুভব করতে পারবে?

তবে ও যে দেশে আছে, সেখানে খুবই ভাল আছে, এটাই একমাত্র সান্ত্বনা। ছেলে বলল,"মন খারাপ কোরো না, প্রতি সামারে তোমরা এখানে চলে এস।" এবারের মত আমেরিকা সফর সাঙ্গ করে, ধীরে ধীরে উড়োজাহাজে উঠে নিজেদের সিটে গিয়ে বসলাম।

দ্য বীন, মিলেনিয়াম পার্ক - শিকাগো

~ শিকাগোর আরও ছবি ~

সুস্মিতা রায়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা হাওড়া জেলায়। কর্মসুত্রে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ডিরেক্টর। নেশা বই পড়া ও গান শোনা। বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই প্রথম কলম ধরা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

মোহময়ী মুরুড

পল্লব ব্যানার্জি

~ মুরুডের আরও ছবি ~

-"ভাইয়া, মুরুড যানে কে লিয়ে গাড়ি কাঁহা সে মিলেগি?"
-"কাঁহা কে লিয়ে?" - ভুরু কুঁচকে মারাঠি ভদ্রলোকের প্রশ্ন।
-"মুরুড, মুরুড - জঞ্জীরা" আরও স্পষ্ট করে কেটে কেটে বলি।
-"স্পেলিং বাতাইয়ে"
এই সব্বনাশ, বলে কী! পুণে শহরের নামী ট্র্যাভেল এজেন্ট, অথচ মুরুডের নাম শোনেনি? যদিও আমি ইন্টারনেট ঘেঁটে স্পটটা খুঁজে বার করেছি, কিন্তু তাতে আর কী যায় আসে? আমাদের কাছে যদি কেউ দিঘা, মন্দারমণি, শান্তিনিকেতন, অযোধ্যা পাহাড়, গৌড় বা দার্জিলিং এর খবর জানতে চায়, আমরা কি স্পেলিং জিজ্ঞেস করব?
পুণের বাসিন্দা আমার এক বন্ধু একদিন ফোনে বলল "সপরিবারে পুণের থেকে একটু দূরে কোনও নিরিবিলি জায়গায় দু-তিন দিন কাটাতে চাই, কোনও স্পটের সন্ধান দিতে পার?" একটু ঘুরে-টুরে বেড়ানোর সুবাদে এমন প্রশ্ন আমার কাছে প্রায়ই আসে। তাছাড়া ছেলেটিও ওই শহরে নতুন। তাই আমিই জি-ম্যাপ খুঁজে সোজা আরব সাগরে ডুব দিয়ে মুক্তোর মতো বার করলাম মুরুড। "স্পেলিং বাতাইয়ে"র ঝামেলা এড়াতে অবশ্য সেই যুগল সেবার মুরুড-মুখো হয়নি। কিন্তু আমার মাথায় জেদ চেপে গিয়েছিল। এদিকে বন্ধুটি প্রায়ই বলে - "একবার আমাদের এখানে এসে বর্ষাটা দেখে যাও"। কলকাতায় বর্ষা মানেই লতা মঙ্গেশকরের "বৃষ্টি-বৃষ্টি-বৃষ্টি", আর পুণেতে কিশোরকুমারের "রিমঝিম গিরে শাওন"। ব্যস, মুরুডের জেদ আর বৃষ্টির নেশা, দুইয়ে মিলে ঠিক করলাম "আর বিলম্ব নয়।"
পুণে থেকে দূরত্ব ২০০ কিলোমিটারেরও কম। সরকারি বাস যায় অনেকটা ঘুরে খান্ডালা, লোনাভলা, আলিবাগ হয়ে। তবে পথের সৌন্দর্য সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। কখনও এক তাল মেঘ এসে বাসটাকে ঘিরে ধরছে, পাহাড়ি ঝরনার জল কখনও ছিটকে আসছে বাসের খোলা জানলা দিয়ে, আবার কখনও পথের দু-ধারের নিশ্ছিদ্র ঘন জঙ্গলের দৃশ্যে গা ছমছম করে উঠছে।

আরব সাগরের বুকে জঞ্জীরা দুর্গ

আরবসাগরের তীরে রায়গড় জেলার ছোট্ট গ্রাম মুরুড। বিচটা ঝকঝকে পরিষ্কার। নারকেল গাছগুলো যেন আমাদের মাথায় ছাতা ধরার ভঙ্গিতে এগিয়ে এসেছে। সমুদ্রের মধ্যে বেশ কিছু দূরে একটা দুর্গ। "জঞ্জীরা ফোর্ট"। ১৪৯০ সালে সিদ্দি রাজার তৈরি। ভারতের একমাত্র অজেয় দুর্গ। বাইরে থেকে আক্রমণ করতে হলে সবাইকেই আমাদের মতো নৌকাতেই দুর্গে পৌঁছাতে হত। আর অমনি কেল্লার ওপর থেকে কামানের গোলায় ঝাঁঝরা হয়ে সলিল-সমাধি। অথচ সেখানকার অধিবাসীরা যাতায়াত করত সমুদ্রের তলার গুপ্তপথে। তাও আবার গোলকধাঁধা। সুড়ঙ্গ দিয়ে নীচে নামলেই মাল্টিপেল চয়েস। তিনটে রাস্তার যেকোনো একটা সঠিক। অভ্যস্ত লোক নাহলে সে পথ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। স্থাপত্য আর বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত মিশেল! মারাঠা "হিরো" স্বয়ং শিবাজিও পারেননি এই কেল্লার দখল নিতে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অহং বোধে আঘাত লাগে। তাই তিনি নিজের ক্ষমতা দেখাতে আর এই কেল্লার ওপর নজর রাখতে আরও একটা দুর্গ তৈরি করলেন সেই সমুদ্রেরই মাঝে। "কাসা ফোর্ট"। যেকোনও হোটেল থেকে এটাই দেখা যায়। সুতরাং মুরুড গেলে একটা নয়, সাগরের মধ্যে জোড়া কেল্লা।

জঞ্জীরা ফোর্টের উদ্দেশে

মুরুডে দেখার জায়গা বেশ কয়েকটা। দু-তিনটে ভাল মানের মন্দির, একটা রাজবাড়ি, একটা জলপ্রপাত - সবগুলোই কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যেই। তবে মূল আকর্ষণ অবশ্যই "জঞ্জীরা ফোর্ট"। কাসা ফোর্ট এখন ভারতীয় নৌসেনাদের দখলে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া সাধারণ পর্যটকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। মুরুডের হোটেল এলাকা থেকে জঞ্জীরা ফোর্ট বড়জোর পাঁচ কিলোমিটার। ভাড়া গাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু অটোর চল বেশি। হোটেলে বলে রাখলে ওরাই অটোর ব্যবস্থা করে দেবে। নাহলেও কোনও চিন্তা নেই। জায়গাটা বেশ ছোট আর মানুষজনেরা বেশ হেল্পফুল হওয়ার জন্য একটু আশপাশটা ঘুরে এলেই সবকিছুর হদিশ পাওয়া যায়। কোথায় বাজার, কোথায় অটো স্ট্যান্ড সব। যাই হোক, আমরা তিন বন্ধু গেলাম অটোতে, আর পুরো পথটা ফিরলাম হেঁটে। সত্যি বলতে কী গাড়ির থেকে পায়ে হাঁটাটাকে স্বর্গীয় মনে হল। বলে বোঝানো যাবেনা সেই পথের সৌন্দর্য। চোখের সামনে ১৮০ ডিগ্রিরও বেশি কোণ করে উন্মুক্ত আকাশ, সাগর আর পাহাড়। একদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে জমিদারের মতো, তার (আমাদেরও) পায়ের নীচে খাজনা দিতে না পারা প্রজাদের মতো লুটিয়ে পড়ছে অ্যারাবিয়ান ঢেউ। অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি পাহাড় আর সমুদ্র এক হয়ে মিশেছে। একটা বিশাল ধূসর মেঘ দায়িত্ব নিয়ে সেখানে তার যাবতীয় অনুরাগ বর্ষণ করে চলেছে। মনে হচ্ছে এক বিরাট চেহারার মালি যেন ঝাঁঝরি করে বাগানে জল দিচ্ছে। তবে এটা ঠিক যে বর্ষার সময় এসেছি বলেই এই তরতাজা প্রাণবন্ত রূপ।

জঞ্জীরা ফোর্টে পৌঁছতে আগে যেতে হবে রায়গড়ের জেটিতে। সেখান থেকে নৌকো করে ফোর্টের দরজায়। এখানে কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ মাঝেমধ্যেই বেশ অশান্ত। নৌকোর লোকজনই সাহায্য করবেন নামা-ওঠায়। কেল্লার ভিতরে গাইডের সাহায্য নেওয়া ভাল। তাতে দুটো সুবিধা। এক পুরোনো দিনের ইতিহাসটা খানিক জানতে পারবেন, আর দ্বিতীয়তঃ কেল্লার ভিতরে পথ হারানোর সম্ভাবনা কম। সমুদ্রের মধ্যে হলেও কেল্লার আয়তন কিন্তু বেশ বড়। পুরোটাই ধ্বংসাবশেষ আর আগাছা জঙ্গলে ভর্তি। সাপখোপও আছে। তাই যেখানে সেখানে ঢুকে পড়া, বা পাথরের খাঁজে কৌতূহলবশত হাত ঢুকিয়ে দেওয়াটা বিপজ্জনক। গাইডের বর্ণনা শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। তখনকার দিনে ভারতীয়দের শিল্প আর স্থাপত্যের নৈপুণ্য আর বিজ্ঞানের দক্ষতা অনুভব করে ভারতীয় বলে গর্ববোধ হয়।

জঞ্জীরা ফোর্টের অভ্যন্তরে

~ মুরুডের আরও ছবি ~

স্কুল শিক্ষক পল্লব ব্যানার্জির নেশা ঘুরে বেড়ানো আর ছবি তোলা। নিজে যা কিছু ভালো লাগে, তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আনন্দ পান। আর সেটা করতে গিয়েই তাঁর মনে হয়েছে বেশির ভাগ বাঙালির মধ্যেই এক ভবঘুরে মন রয়েছে। শুধুমাত্র তাকে জাগিয়ে তোলার অপেক্ষা। সেই তাগিদেই লেখা আর ছবি তোলার কাজে মন দিয়েছেন। শহর বা চেনা জায়গা নয়, অনেক দূরে যেখানে দিনে পাখির ডাক, আর রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ থাকে না সেই জায়গাই তাঁর ভবঘুরে মনকে ডাকে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

এক নিমজ্জিত অরণ্যে

জামাল ভড়

~ পেরিয়ারের আরও ছবি ~

সালটা মনে আছে ২০০৯, অক্টোবরের এক সকাল। সংবাদপত্র খুলেই চোখ গেল -- পেরিয়ার লেকে লঞ্চডুবিতে বহু পর্যটক নিহত। খুবই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেই অভিশপ্ত পেরিয়ার লেক দেখার সুপ্তবাসনা পূরণ হল ২০১১-র অক্টোবরে। অভিশপ্ত কেন? পরে বলছি। দক্ষিণ ভারতের মুখ্য শৈলশহর মুন্নার থেকে সোজা কেরলের থেক্কাডি। এলাম স্করপিওতে। প্রশস্ত মসৃণ রাস্তা। গাড়ি তীব্রগতিতে সাঁই সাঁই ছুটল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নীলগিরির দক্ষিণে কার্ডামম ও পান্ডালাম পর্বতের পাদদেশে থেক্কাডি মশলার শহর, না না শহর নয় মশলার গঞ্জ। কেননা অঞ্চলটি এখনো গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে। এলাচ-লবঙ্গ-দারচিনি-তেজপাতা-জায়ফল-জয়িত্রির গন্ধে সারা এলাকা ম-ম করছে।

জানা ছিল সারা পৃথিবীতে মাত্র সাতটি নিমজ্জিত অরণ্য আছে। তার মধ্যে ভারতে একটি এবং সেটি কেরলের থেক্কাডির নিকটবর্তী পেরিয়ার লেক। থেক্কাডি পৌঁছে বিশ্রাম। পথচলার ক্লান্তি ঢাকতে নয়, শহরটাকে চিনতে-বুঝতে। যেখানেই যাই সেই স্থানটাকে জানতে একটা দিন ব্যয় করি। তাতে বেড়ানোয় বেশ সুবিধাই হয়। পরদিন প্রথমেই গেলাম ইডুক্কি ও পাথানামিথা জেলার মধ্যবর্তী ৭৭৭ বর্গ কিলোমিটারের পেরিয়ার অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্যের মধ্যে ২৬ বর্গ কিলোমিটারের এই অনবদ্য সুন্দর পেরিয়ার নামক কৃত্রিম হ্রদ দেখতে। বলে রাখি এই অভয়ারণ্যের মধ্যে আবার ৩৫০ কিলোমিটার গভীর অরণ্য। ইংরাজি ওয়াই বর্ণের মতো এই অপূর্বসুন্দর হ্রদটির জন্ম বেশিদিন নয়। তামিলনাড়ুর সুন্দরমালা পর্বতের শিবগিরি শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন ও আরবসাগরে পতিত ২৪৪ কিলোমিটারের দৈর্ঘ্যের পেরিয়ার নদীতে ১৮৯৫ সালে মুল্লাপেরিয়ার বাঁধ দেওয়ার ফলে গাছপালাসহ অরণ্যের একাংশ ডুবে গিয়ে এই হ্রদের সৃষ্টি। হ্রদের বুকে এখনও অনেক নিমজ্জিত গাছের গুঁড়ি দৃশ্যমান। লঞ্চ একেঁবেঁকে এই গাছগুলির ফাঁক দিয়ে সর্পিলাকারে চলে।

বিশাল লম্বা লাইন টিকিটের জন্য। দাঁড়িয়ে পড়লাম লাইনের পিছনে। গল্পে গল্পে কখন যে টিকিট কাউন্টারের একেবারে সামনে চলে এলাম খেয়াল করিনি। আমাদের ভাগ্যে 'জলরাজা' নামের লঞ্চ। উঠলাম জলরাজায়। বিপুলাকার লঞ্চ - প্রায় শ'তিনেক যাত্রী উঠল। প্রত্যেকের আসন নির্ধারিত। লঞ্চে উঠে লাইফজ্যাকেট পরতে হয়। ২০০৯-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর জলকন্যা নামে দ্বিতলবিশিষ্ট লঞ্চডুবির পর থেকে লাইফজ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক। সেবার সলিলসমাধি হয়েছিল ৪৫ জন পর্যটকের - বেশির ভাগই ছিল কলকাতা ও দিল্লিবাসী।

কী নয়নাভিরাম দৃশ্য ! ঘন বনপরিবেষ্টিত গভীর হ্রদের জলে লঞ্চ যখন ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে তখন হয়তো দেখবেন একদল ঢোল (বন্য সারমেয়) হ্রদের পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা কোথাও একদল শিয়াল গলা উঁচু করে ডাকছে। আর বন্য হস্তীর যূথবদ্ধ বিচরণ তো দেখবেনই। ২০১০এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে এক হাজারের কাছাকাছি হাতি, ৫৩টি বাঘসহ প্রায় অর্ধশত প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিদ্যমান। নীলগিরি থরের (পৃথিবীর একমাত্র বৃহৎ বন্য অজা), চিতা, বার্কিংডিয়ার, বনবরা আর নিকটবর্তী বৃক্ষশাখায় বা লেকে প্রোথিত মৃতগাছের গুঁড়িতে গাংচিল, জলকুক্কুট, পানকৌড়ি, বক, শামুকখোল, হরিয়াল, রঙ-বেরঙের মাছরাঙা প্রভৃতি হাজারো প্রজাতির ছোটবড় হরেক পাখি বসে আছে। পক্ষীপ্রেমী হলে ক্যামেরাবন্দি করুন। নইলে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। পাখি দেখলেই আমার মন আনচান করে। ফলে আমার আনন্দ দেখে কে ! বহু অভয়ারণ্য আমি ঘুরেছি, কিন্তু এ এক অন্য অনুভূতি। জলবিহারে অরণ্যবিচরণ! সুন্দরবনের সাথে এক করলে কিন্তু চলবে না, দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

থেক্কাডি থেকে মাত্র এগার কিলোমিটার দূরে অরণ্যাভ্যন্তরে এই অপরূপ হ্রদ শুধু দর্শন নয় উপভোগ করে আমরা গেলাম থেক্কাডির অন্যপ্রান্তে মুরিকাড্ডিতে মশলাবাগিচা দেখতে দশটাকা দর্শনীর বিনিময়ে। কী নেই সেই বাগানে! হরিদ্রাগাছসদৃশ এলাচগাছের ভূমিসংলগ্ন কান্ডে স্তরে স্তরে এলাচ ফলে আছে। গাইড আমাদের বলে বলে দিচ্ছিলেন কোন্টা কোন গাছ। নইলে কী বুঝতাম, বিশেষত যেগুলিতে ফল ধরে নেই।

থেক্কাডিতে সারে সারে ম্যাসাজপার্লার। আপনার পায়ে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, সব ব্যথার উপশম ওই পার্লারে। বিশেষ বিশেষ ভেষজবল্কলচূর্ণ বা নির্যাস দিয়ে বিশেষ মর্দন প্রথায় ব্যথা নিমেষে উধাও। সন্ধ্যাবেলায় উপভোগ করলাম একশ টাকার বিনিময়ে কেরলের বিশিষ্ট লোকনৃত্য কথক সহ অন্যান্য মনমাতানো নৃত্যকলা। তার পর এদিক-ওদিক ঘুরলাম কিছুটা। সর্বধর্মের পীঠস্থান এই থেক্কাডি। স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথা বললাম।

মৈনাকপর্বত যেমন সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত মুনির অভিশাপে, তেমনি এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারের ভুলে গভীর জঙ্গলের কিয়দংশ নিমজ্জিত হয়ে এই হ্রদ। এটা অভিশাপ না আশীর্বাদ সে বিচারের ভার আপনাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা চললাম তিরুবনন্তপুরমের উদ্দেশ্যে।

~ পেরিয়ারের আরও ছবি ~

পেশায় শিক্ষক জামাল ভড়ের শখ দেশবিদেশের মুদ্রা ও নোট সংগ্রহ এবং ভ্রমণ । পাশাপাশি নেশা সাহিত্য চর্চা - বিশেষত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা। বিভিন্ন সময়ে আজকাল, ওভারল্যান্ড, কলম ইত্যাদি নানান পত্রপত্রিকা ও ওয়েব ম্যাগাজিনে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ২০১০-এ সোনাঝুরি ওয়েবম্যাগাজিনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কবি - 'সোনার স্রষ্টা' পুরস্কার লাভ।